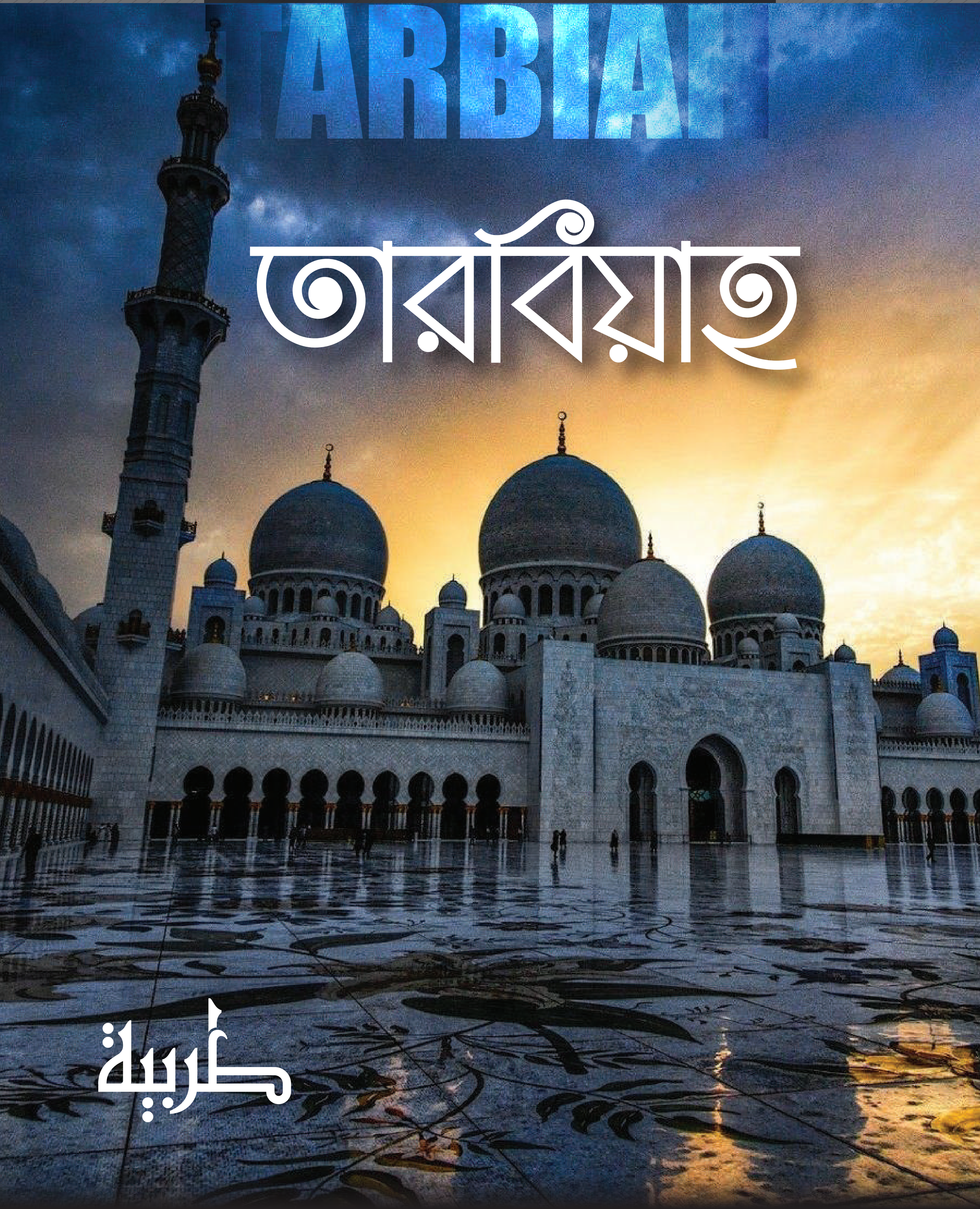
TARBIAH | 1441 | 2020 | ISSUE-2



AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস



সূচী



সম্পাদকীয়

আউজু বিল্লাহি মিনাস শাইতানির রাজিম
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। সালাম ও দরুদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবাগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা হক্ক পথের অনুসারী থাকবেন তাদের উপর।

তারবিয়াহ ম্যাগাজিনের ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,
যুগে যুগে যেসকল আল্লাহর বান্দারা এই জমিনের বুকে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য চেষ্টা করে গেছেন তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় এক ছিল। সেটা হল - তারা আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও মহত্ত উপলব্দি করতে পারতেন, আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসতেন এবং বান্দার কাছে রবের চাওয়াটা কি সেটা খুব ভালো ভাবে বুঝতেন। এই বুঝটা যার যত শক্ত দ্বীনের উপর ইস্তিকামাত থাকা তার জন্য তত সহজ। অবশ্যই তাওফিকদাতা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা।

এই বুঝ অর্জন করার জন্য ইলম অন্বেষণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা জরুরী। আমাদের ভাই ও বোনদের ইলম অন্বেষণকে একটু সহজ করার জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি এই লেখাগুলো উম্মাহর তরবিয়তের জন্য উত্তম উপাদান হয়ে যাক।

প্রিয় ভাই ও বোন,
আমাদের যাদের নিকট হক্কের দাওয়াত আল্লাহ তায়ালা পৌঁছেছেন তাদের উপর এখন এই দাওয়াহ উম্মাহর অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয়া দায়িত্ব হয়ে আছে। আমরা নিজেরা প্রতিনিয়ত নিজেদের তরবিয়তের জন্য ফিকির করবো এবং উম্মাহর সে সকল ভাই বোনদের কাছে হক্কের বাণী পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবো যারা এখনও হক্কের দাওয়াত পাননি।

এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবো আমাদের কম জানা-শোনার কারণে অন্য ভাইবোনদের সামনে যেন ফেতনার আরেকটা রাস্তা খুলে না দেই। নিজেরা যেন ফেতনার কারণ না হয়ে দাড়াই।

পরিশেষে সকল ভাইবোনদের কাছে আমাদের নির্যাতিত মুসলিম ভাই-বোন, বন্দী ভাই- বোন ও মুরুব্বীদের জন্য দোয়ার দরখাস্ত। আল্লাহ তায়ালা সকলকে ফেতনা ও তাগুত থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহ তা'আলার কালিমা 'সুউচ্চ' হওয়ার দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

(মুজাহিদিনদের উদ্দেশ্যে আমিরুল মু'মিনীন **শাইখ হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা হাফিজাহুল্লাহ** এর হেদায়াতী বয়ান)

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন –

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿40﴾ -

"যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষন্ন হয়োনা, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুত: আল্লাহ কাফেরদের মাথা নিচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবাহ আয়াত নং ৪০)

তাফসিরে ইবনে কাসীরে এই আয়াতের বর্ণনায় এসেছে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-কুফরি কালিমা দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'শিরক'। আল্লাহ তা'আলার কালিমা দ্বারা বোঝানো হয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তাফসিরে ত্ববারিতে 'কালিমাতুল্লাহ' দ্বারা আল্লাহ তায়ালার দ্বীন, তাওহীদ ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার কালিমা সুউচ্চ হওয়ার বিষয়টি শরয়ী আইন বাস্তবায়ন হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। আর শরয়ী আইন কার্যকর হওয়া ইসলামি হুকুমত (খিলাফাহ বা ইমারাহ) কায়েম হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। যখন শরয়ী হুকুম কার্যকর হবে তখন ইসলামি হুকুমত বাস্তবায়ন হবে। আর এভাবে আল্লাহর কালিমা সুউচ্চ হবে। এ কারণে মুজাহিদগণ যখন কাফেরদের দখল থেকে কোন এলাকা বিজয় করেন তখন এই নিয়ত থাকা চাই যে, তাতে শরয়ী আইন কার্যকর করা হবে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এটাই যে- আল্লাহ তা'আলার জমিনে আল্লাহ তা'আলার কালিমা সমুন্নত করা।

যখন কারো নিয়ত 'আল্লাহ তা'আলার কালিমা সুউচ্চ করা' না হবে অর্থাৎ (জিহাদের) মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এটা না হবে, তখন তাকে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় মৃত্যুবরণ করলে শহীদ বলা হবেনা। একজন শহীদ মৃত্যুর পর যে নিয়ামতের উপযুক্ত হয়, সে তার উপযুক্ত হবে না। আল্লাহ তায়ালা শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾-

"আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকা-প্রাপ্ত। (১৬৯) আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয় ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই। (১৭০) আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ, ইমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না (১৭১)।"

-(সূরা আলে ইমরান ১৬৯-১৭১ নং আয়াত)

শাহাদাত এমন এক মূল্যবান নিয়ামত যার আকাঙ্ক্ষা স্বয়ং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তিন বার কামনা করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আমি কামনা করি যে, - আমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করি এবং শহীদ হয়ে যাই, আবার লড়াই করি এবং শহীদ হয়ে যাই, আবার লড়াই করি এবং শহীদ হয়ে যাই।" এছাড়াও আরো বহুসংখ্যক আয়াত ও হাদিসে শহীদদের সুউচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যে ব্যক্তির নিয়ত সহীহ-শুদ্ধ হবেনা, আর এ অবস্থায় সে মারা গেল। তো সে ঐ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে না।

জিহাদ দ্বারা ব্যক্তির নিয়ত যদি আল্লাহ তা'আলার কালিমা সুউচ্চ করা না হয়, তবে তার জন্য আল্লাহ তায়ালার কোন প্রতিদান নেই। বরং সে শাস্তির উপযোগী হবে। যেমন - হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি- "কিয়ামতের দিন প্রথমে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ফায়সালা করবেন যে শহীদ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তার সামনে ঐসকল নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন যা আল্লাহ তা'আলা তাকে পার্থিব জীবনে দান করেছিলেন। এই বান্দা ঐসব নিয়ামত সত্যায়ন করবে।" তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, "আমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত ঐসব নিয়ামতের বদলায় কি ফায়দা হাসিল করেছিলে?" সে বলবে, "আমি আপনার রাস্তায় শহীদ হওয়া পর্যন্ত জিহাদ করেছিলাম।" আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এজন্যে জিহাদ করেছিলে যে,

মানুষ তোমাকে বীর-বাহাদুর বলবে। আর তা তো মানুষ তোমাকে বলেছে।" তারপর ঐ ব্যক্তিকে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম শরিফ)

হযরত সাহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

"মুসলিমদের নিয়ত তার আমল থেকে উত্তম। আর মুনাফিকের আমল তার নিয়ত থেকে উত্তম। প্রত্যেকেই তার নিয়ত অনুযায়ী আমল করে। যখন মুসলিমগণ কোন আমল করে তখন তাঁর অন্তর নূরে ভরে যায়"। (তবরানী)

নিয়তের ফায়দাসমূহ:-

১। নিয়তের মাধ্যমে আমল শক্তিশালী হয়:

হযরত আবু সাইদ খুদরি ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "তোমরা আমার সাহাবিগণকে ভালো-মন্দ কিছু বলো না। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ - তোমরা যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সম্পদও আল্লাহর রাস্তায় দান কর, তবুও তাঁদের এক বা অর্ধ 'মুদ' সম্পদের সমান সাওয়াব অর্জন করতে পারবে না। (বুখারী শরীফ)

এ হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বোঝানো যে, নিয়ত ও ইখলাসের বরকতে তাঁদের সামান্য সাদাকাহ আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রতিদানের দিক থেকে এত বেশী যে, তোমরা উহুদ পাহাড় পরিমাণ দান করেও সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- তাকওয়া ভিত্তিক (আল্লাহ তায়ালার যথাযথ ভয়) আমল যতই কম হোক না কেন? তা কম নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার নিকট মকবুল আমলই বেশী প্রিয়, তা আবার কম হবে কিভাবে? (হাদীস অনুযায়ী) তা তো কম হওয়ার কথা নয়। (ইবনে আবি দুনইয়া/ ابن ابي دنيا)

ইমাম গাজ্জালী রহ. তাঁর 'ইহয়াউল উলুম' কিতাবে লিখেন: "সালফে সালিহীনদের কেউ কেউ বলেছেন - কোন কোন সময় দেখা যায় যে, আ'মল খুবই ছোট কিন্তু সহীহ-নিয়তের কারণে তা অনেক বড় আ'মলে পরিণত হয়। আবার কখনো আ'মল অনেক বড় হয় কিন্তু নিয়তের গরমিলের কারণে তা (অগ্রহণযোগ্য) নগণ্য আমলে পরিণত হয়।"

মোটকথা, প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের জন্য আবশ্যক হল 'নিয়তকে শুদ্ধ করে নেয়া'। তাহলে একজন মুজাহিদের তো সবার আগেই নিয়তকে শুদ্ধ করা দরকার। কেননা সে যখন নিয়তকে শুদ্ধ করে অল্প কোন আ'মল করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তা প্রতিদানের দিক থেকে অনেক বড় করে দিবেন ইনশা আল্লাহ।

২। বিশুদ্ধ নিয়তের ফলে দুয়া ও আমল কবুল হয়:

সিরারুল গুজ্জাহ বলেন আমি আব্দুল ওয়াহহাব বিন যায়েদ থেকে শুনেছি- "কবুলিয়ত বা গ্রহণযোগ্যতার সাথে বিশুদ্ধ নিয়তের এত মজবুত সম্পর্ক যে, উভয়ের মাঝে কোন ধরণের দূরত্ব থাকেনা। (ইবনে আবি দুনইয়া/ابن ابي دنيا)

সতর্ক বাণী: আমাদের দোয়া কবুল হয় না কেন? কারণ হচ্ছে আমাদের দোয়ায় ইখলাস নেই। অথচ দোয়া কবুলের সম্পর্কই হচ্ছে ইখলাসের সাথে।

৩। বিশুদ্ধ নিয়তের ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের দিলকে খাঁটি মুমিনদের দিকে ফিরিয়ে দেন:

মোহাম্মাদ বিন ওয়া'সি রহ. বলেন, "যে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী করে দিবে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরকে তার দিকে ঝুঁকিয়ে দিবেন। অর্থাৎ যখন কোন মুসলমান সহীহ নিয়ত ও ইখলাসের সাথে জিহাদ বা অন্য কোন ইবাদত করবে তখন আল্লাহ তা'আলা বাকি মুসলমানদের অন্তরে তার এই বান্দার মোহাব্বত পয়দা করে দিবেন। (ইবনে আবি দুনইয়া/ ابن ابي دنيا)

৪। বিশুদ্ধ নিয়তের ফলে আ'মালের পাল্লা ভারী হয়:

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন, "যার বাহ্যিক হালত অভ্যন্তরীণ হালত থেকে ভাল অর্থাৎ বাহ্যিক অবস্থা সুন্দর কিন্তু ভিতর-গত হালত শরীয়ত বিরোধী। তো কিয়ামতের দিন তার আ'মালের পাল্লা হালকা হবে। আর যার অভ্যন্তরীণ হালত (আ'মালের দিক থেকে) বাহ্যিক হালত থেকে ভাল। তো কিয়ামতের দিন তার আ'মালের পাল্লা ভারি হবে। (ইবনে আবি দুনইয়া/ابن ابي دنيا)

উল্লেখ্য যে, কিয়ামতের দিন আ'মালের পাল্লা ভারী বা হালকা হওয়ার বিষয়টি বিশুদ্ধ নিয়তের সাথেই সম্পৃক্ত।

৫। আল্লাহ তা'আলার (ওয়াদা-কৃত) নুসরত বিশুদ্ধ নিয়ত ও ইখলাসের সাথে অর্জিত হয়:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, "প্রত্যেক মানুষ আল্লাহ তা'আলার নিকট তার নিয়তের শুদ্ধতা অনুযায়ী প্রতিদান পাবে"। (শরহুল মুহাজ্জাব)

হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ রহ. খলীফা-তুল মুসলিমীন উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এর নিকট, লিখেন যে, "ভালো করে জেনে রাখো!! প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলার নুসরত তার নিয়ত অনুযায়ীই হয়। যার নিয়ত পরিপূর্ণরুপে বিশুদ্ধ হবে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে পরিপূর্ণরুপে নুসরত দান করবেন। আর যার নিয়তে কমতি কিংবা অসম্পূর্ণতা থাকবে, আল্লাহ তা'আলার নুসরতও সে কম ই পাবে।" (ইহয়াউল উলূম)

সুতরাং প্রত্যেক মুজাহিদ, বিশেষ করে উমারাদের জন্য আবশ্যক হল- নিজেদের নিয়তকে পরিপূর্ণরুপে শুদ্ধ করে নেয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলার নুসরত তো বিশুদ্ধ নিয়তের সাথেই সম্পৃক্ত।

وما علينا الا البلاغ المبين

অনুবাদ: আবু খাদিজা



দাওয়াতের পদ্ধতি ও জিহাদি মানহাজের হেফাযত - ২

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

দাওয়াতের তরীকার মধ্যে বাড়াবাড়ি কেন সৃষ্টি হয়?

১. প্রথম কারণ- শ্রোতাদের থেকে অমুখাপেক্ষী ও বেপরোয়া হওয়া।

প্রিয় ভায়েরা!
দাওয়াতের পদ্ধতিতে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা নানান কারণে সৃষ্টি হতে পারে। তবে মূল কারণ হলো- দাঈর ফিকির, আমল-আখলাক সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া। ভিতরগত আরেকটি কারণ হলো- শ্রোতার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা ও তার ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়া।

কেউ যদি দুনিয়াবি বিষয়ে আল্লাহর জন্য মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষীতা অবলম্বন করে তাহলে সেটা তো একটি ভালো গুণ। কিন্তু এর স্থান দাওয়াতের ময়দান নয়। দাওয়াতের ময়দানে শ্রোতাদের থেকে অমুখাপেক্ষীতা কাম্য নয়। কাম্য হলো উম্মাহর জন্য কল্যাণকামীতা ও দরদ থাকা। দাঈর দুনিয়া আখেরাতের সফলতার জন্য শর্ত হলো, সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্যও তাই পছন্দ করবে।

একজন দাঈ খুব করে চান মানুষ যেন তার আহবানে সাড়া দেয়। এজন্য সে তার দাওয়াতকে খুব ভালো আর উপকারী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে থাকে। তার উদাহরণ হল ঐ ডাক্তারের মত, যে আন্তরিকভাবে রোগীর চিকিৎসা করে। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করে, তার জন্য ব্যথিত হয়। রোগীর একেকবার 'আহ' উচ্চারণের সাথে সাথে তার অন্তর চূর্ণ- বিচূর্ণ হয়ে যায়। শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত রোগীকে বাঁচানোর চিন্তায় অস্থির থাকে। যে সকল ডাক্তার শুধু রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ঘোষণা করেই চলে যায়, সে ঐ ডাক্তারের মত না। রোগীর সাথে দাঈর একটা আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।

'গুলু' আক্রান্ত ব্যক্তি তার দাওয়াত কেউ কবুল করল কি করল না- এই বিষয়ে কোন পরওয়া করে না। সে সর্বাবস্থায় নিজেকে হক মনে করে। নিজেকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ভেবে নিয়ত ও অন্তরের অবস্থার হিসাব নেয় না। দাওয়াতের হক আদায় হলো কি না এই নিয়ে ভাবে না। দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিজের কথা ও কাজের মধ্যে কোন ত্রুটি হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে ভাবে না। "কোন কাজে সুন্নতের খেলাফ হয়নি তো? "দাওয়াতের ক্ষেত্রে মূর্খতাকে মূলভিত্তি হিসেবে ধরে নেই নি তো?" " আমার প্রকাশভঙ্গিতে বাড়াবাড়ি হয়নি তো?" -এই ধরণের ফিকির গুলুতে আক্রান্ত ব্যক্তিতে অনুপস্থিত। সে নিজের হিসাব নেয় না।

এসকল হিসাব-নিকাশে তার কোন খেয়ালই নেই। নিজেকে সে বড় মনে করে। "সত্যকে প্রকাশ করতে হবে"এমন একটা ভাব তার মধ্যে। অথচ এটা এমন এক অনুভূতি, যা পরবর্তীতে আত্মম্ভরিতা ও অহংকারে পরিণত হয়।

গুলুতে আক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত রসকষহীন ভাবে নিজের দাওয়াতের ঘোষণা দেয়। কুরআন সুন্নাহতে দাঈর যে গুণাবলী আছে সে তার পরিপূর্ণ উল্টা। নবীগণের এক এক জন মানুষকে বাঁচানোর চিন্তা থাকতো। এই উদ্দেশ্যে তারা দিন-রাত এক করে ফেলতেন। মানুষকে হেদায়াতের পথে আনার জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট তারাই করেছেন। রাতে উঠে আল্লাহর কাছে মানুষের হেদায়াত চাইতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই চিন্তায় এত বেশি কষ্ট করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তার সাক্ষ্য দিয়েছেন-

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

অর্থঃ তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে সম্ভবত তাদের পিছনে ঘুরে তুমি দুঃখে নিজেকে শেষ করে দিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরদটা দেখুন। সম্মুখ যুদ্ধের ময়দান। ইহুদিদের মত শত্রুর বিরুদ্ধে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তলোয়ার দিয়ে পাঠাচ্ছেন। তখনও তাকে নছিহত করছেন, "তোমার হাতে একজন মানুষের হেদায়াত পাওয়া তোমার জন্য লাল উট পাওয়ার চেয়েও উত্তম"।

দাওয়াতের উসলুবে গুলু আসার দ্বিতীয় কারণ হলো - বুঝ কম থাকা। আল্লাহ তাআলার শরয়ী তাকবীনী উসুল সম্পর্কে যার ধারণা আছে - সে জানে যে, জিহাদের ময়দানে কামিয়াবির জন্য আল্লাহর পরে নিজেকে মুসলমান জনসাধারণের সাহায্য-সমর্থনের মুখাপেক্ষী মনে করতে হবে। সে জানে মুমিনের সমর্থন আল্লাহর নুসরতের একটি সুরত।

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ

"তিনিই আপনাকে তার সাহায্য ও মুমিনদের একতা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।

একারণেই দাওয়াতের শুরুতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেলার মধ্যে আরব গোত্রগুলোকে দাওয়াত পেশ করতেন। তখন একথাও বলতেন, "আমাকে কে আশ্রয় দেবে? আমাকে কে সাহায্য করবে?"

তো মুসলমান জনসাধারণকে নিজেদের সমর্থনকারী, সাহায্যকারী বানানো শরয়ী ও আকলী তাকাযা। শরয়ী সীমারেখার মধ্যে থেকে মুসলমান জনসাধারণকে নিজেদের জিহাদের অংশ বানানোর চেষ্টা করা ওয়াজিব। কিন্তু জিহাদের প্রতি দাওয়াত প্রদানকারীদের কম বুঝের অবস্থাটা দেখুন-

তারা কয়েক ডজন বা কয়েকশ মানুষ নিজেরাই দুনিয়ার সব মুসলমানকে নিজেদের বিরোধী বানিয়ে নেয়। তারপর আবার পুরো দুনিয়ায় বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তারা কুফুরী নেজাম বিলুপ্তি ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার মত বড় দাবি করে, কিন্তু জনসাধারণ ও দ্বীনদার লোকদেরকে নিজেদের সাথে শরীক করার কোন চেষ্টাই তাদের মাঝে নেই। মুসলমান জনসাধারণকে নিজেদের সমর্থনকারী, সাহায্যকারী বানানো ছাড়া কুফুরী শাসনব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা তো দূরে থাক, নিজেদের আন্দোলনকেই বেশিদিন চালু রাখা সম্ভব না এই বুঝটা তাদের মাঝে আসে না।

শায়খ আবু মুসআব যারকাবী রহ. আমেরিকাকে ইরাকে থাকা প্রায় অসম্ভব বানিয়ে দিয়েছিলেন। শেষমেশ আমেরিকা ইরাক থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেসময় শায়খ আইমান যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ, আবু মুসআব যারকাবী রহ. কে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিতে শায়খ আইমান দা. বা. বলেন: যখন আমরা দুই টার্গেটের দিকে তাকাবো, অর্থাৎ আমেরিকাকে ইরাক থেকে বের করা ও এখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা - তখন আমরা দেখতে পাব, আল্লাহর সাহায্য ও তাওফিকের পরে মুজাহিদদের জন্য সব থেকে প্রভাব বিস্তারকারী ও শক্তিশালী অস্ত্র হলো ইরাক এবং তার আশেপাশের মুসলমান জনসাধারণের সমর্থন।

আমাদের জন্য জরুরী হলো- এই জনসমর্থন রক্ষা করা এবং শরয়ী সীমারেখার মধ্যে থেকে এই সমর্থনকে বাড়ানো।

এ প্রেক্ষিতে আমি আপনাকে কয়েকটি কথা আরজ করছি-

প্রথমত, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে (ইরাকে) ইসলামের বিজয় এবং খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ছাড়া তাদেরকে হটানো সম্ভব নয়। এটাও বাস্তবতা যে, জনসাধারণের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া এই মহান লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। যদি কোথাও জনসাধারণের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া বিজয় হয়েও যায়, তবুও যেকোন সময় এই বিজয় পরাজয়ে পরিণত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যদি জিহাদি আন্দোলনের সাথে জনগণের সমর্থন না থাকে তাহলে এই আন্দোলন মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে সরে একসময় হারিয়ে যায়। এই অবস্থায় জিহাদি গ্রুপ ও রাষ্ট্রের উপর চেপে বসা জালিম সম্প্রদায়ের মধ্যকার এই যুদ্ধ নিঃশেষ হয়ে যায়।

একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে- ক্ষমতাশীলরা সবসময় জনগণকে জিহাদি দল ও জিহাদি আন্দোলনের ব্যাপারে একদম অন্ধকারে রাখতে চায়। আমাদের উপর চেপে বসা সেকুলাররা এটাই চায়। তারা জানে জিহাদি আন্দোলনকে দমন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ আন্দোলনকে ধোঁকা ও শক্তির মাধ্যমে জনসমর্থন থেকে দূরে রাখা সম্ভব। এজন্য এই যুদ্ধে আমাদের জন্য জরুরী হল - আমরা জনগণকে আমাদের সাথে রাখব। জিহাদি আন্দোলনের নেতৃত্বেও তাদেরকে অংশীদার বানাব। আমাদের এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে যা আমাদেরকে জনসাধারণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

শায়খ যাওয়াহিরী অন্য এক জায়গায় বলেন:
গেরিলা হামলাকারী মুজাহিদদের যদি পিছিয়ে আসতে হয় তাহলে তার কারণে পেরেশান হওয়া উচিৎ নয়। কারণ তাদের যুদ্ধ জনগণকে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করার যুদ্ধ, জমিন দখলের যুদ্ধ নয়।

৩. তিন নং কারণ হলো মুদারাত(সৌজন্য) ও মুদাহানাতের (খোশামোদ, চাটুকারিতা) মাঝে পার্থক্য না করা।

দাওয়াতের মাঝে গুলুর আরেকটি কারণ হলো মুদারাত মুদাহানাতকে এক মনে করা। অথচ উভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। একটি জায়েজ এবং প্রশংসনীয়, অন্যটি নিন্দনীয়। ইমাম কুরতুবী রহ. মুদারাত মুদাহানাতের মাঝে পার্থক্য এভাবে বর্ণনা করেছেন: "মুদারাত হলো দুনিয়া বা দ্বীন অথবা উভয়টির ফায়দার জন্য দুনিয়াবি বিষয় ত্যাগ করা। যা জায়েজ, অনেক সময় মুস্তাহাব কিন্তু মুদাহানাত হলো দুনিয়ার জন্য দ্বীনকে ত্যাগ করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

মানুষের সাথে সৌজন্য আচরণ ছদকা(তাবারানী)

শারেহ ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন: সৌজন্য মুমিনের আখলাকের অংশ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের সামনে নিজের কাঁধকে ঝুঁকানো। কথাবার্তায় তাদের সাথে শক্ত ব্যবহার না করা। এই গুণ নিঃসন্দেহে মহব্বত সৃষ্টির একটি উত্তম মাধ্যম"

সুতরাং শ্রোতার বিরোধিতায় ধৈর্য ধারণ করা, দাওয়াতের জন্য নরম-কোমল ও উপকারী পদ্ধতিতে হকের দিকে আহবান করা এবং শ্রোতার ভ্রান্ত মতকে কোনভাবেই সঠিক না বলা এটা মুদারাত, এটা প্রশংসনীয়। কিন্তু যদি এই নরম ব্যবহারের সাথে বাতিলকে হক বলা হয় - তখন সেটা মুদাহানাত, এটা নিষেধ। এজন্যে দাঈর মুদারাত-মুদাহানাতের সীমারেখা বুঝা উচিৎ। যাতে মুদারাতের নাম দিয়ে মুদাহানাতে লিপ্ত না হয়। অথবা মুদাহানাতের বিরোধিতা করতে গিয়ে মুদারাতও পরিত্যাগ না করে।

আফসোস! আজ কিছু দ্বীনদার শ্রেণী দাওয়াতে বিচক্ষণতার নাম দিয়ে গণতন্ত্র, স্বদেশপ্রেম, সেক্যুলারিজ্যমকে পর্যন্ত সমর্থন করে। অথচ কুফুরি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধিতা কাম্য। কিন্তু এই হযরতরা তাদের সাথে সমঝোতা ও সহযোগিতামূলক আচরণ করে। আর যদি কেউ ফরজ ডাকে 'লাব্বাইক' বলে বাতিল শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাড়িয়ে যায় এবং এই নিকৃষ্ট পথে বাঁধা হয়ে দাড়ায়, তখন তারা তাকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করে। এই গণতন্ত্র ও অন্যান্য মানুষ নির্মিত মতবাদে অংশগ্রহণ ও সমর্থন- শরীয়তের খেলাফ কাজ।

কিন্তু আশ্চর্য! এই অনৈসলামিক কাজও দীনী মাছলাহাত নাম দিয়ে ইসলামী কাজ প্রমাণিত করা হচ্ছে। এটা স্পষ্ট মুদাহানাত। এটাই ঐ মহা বিপদ যার কারণে আজ আল্লাহর শরিয়ত পরাজিত, আর গাইরুল্লাহর আইন বিজয়ী।

সুতরাং এই মুদাহানাতের পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং তার বিরোধিতা করা অত্যন্ত জরুরী। আর মুজাহিদদেরও উচিৎ সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা যাতে তাদের মধ্যে কোনভাবে এই মহামারী প্রবেশ না করে। আরেকদিকে এই মুদাহানাতের বিরোধিতা করতে করতে আমাদের কোন কোন গ্রুপ মুদারাতকেও মুদাহানাত মনে করা শুরু করছে।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হল বাতিলকে সরাসরি বাতিল বলা এবং হককে হক বলা। তারপর হকের দিকে দাওয়াত দেয়া এবং পুরো দাওয়াতি আমল শরীয়ত অনুযায়ী করা। এই দাওয়াত নরম ও কোমল পদ্ধতিতে হেকমত অনুযায়ী হয়। মানসিকতার ভিন্নতার কারণে এই ধরণের দাওয়াত কারও কারও কাছে মুদাহানাত মনে হয়। তার কাছে এই দাওয়াত গ্রহণযোগ্য নয়। তার মানসিক শান্তি তখনই হয়, যখন দাওয়াতের প্রাণ ও ভাষা উভয় দিক থেকে খুব শক্ত হয়। যে দাওয়াতের মধ্যে শ্রোতার প্রতি কোন কল্যানকামিতা বা দরদ ব্যথা থাকে না বরং হিংসা, ঘৃণা, শত্রুতা ও খাটো করা হয় সেটা তার কাছে দাওয়াতের উত্তম পদ্ধতি মনে হয়। ভিন্ন এই মানসিকতার কারণে এই সমস্ত কাজকে সে হকের তাকাযা মনে করে। অথচ এটা গুলু বা বাড়াবাড়ি । এর কারণে দাওয়াতের উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। এবং জিহাদের উল্টো ক্ষতি হয়।

চতুর্থ কারণ- তাড়াহুড়া এবং দাওয়াতের ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞতা।

দাওয়াতের তরীকার মধ্যে কঠোরতার বড় একটি কারণ হলো তাড়াহুড়া প্রবণতা। অনেক সময় ভালো ভালো মানুষও এর শিকার হয়ে যায়। যখন সে দেখে যে, দ্বীনদার শ্রেণী; বিশেষ করে উলামায়ে কেরাম, এবং দ্বীনী রাজনৈতিক দলগুলো তার সাথে নেই, তারা নীরব ভূমিকা পালন করে অথবা তার সাথে কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে, তখন সে ধৈযর্হারা হয় যায়। এরফলে দাওয়াতে কঠোরতা সৃষ্টি হয়ে যায়।
আমাদের সামনে যদি আমরা দাওয়াতের ঐতিহাসিক বাস্তবতা রাখি, তাহলে এই কঠোরতা করব না। বাস্তবতাটা হলো- যখনই এমন কোন বিপ্লবের সূচনা হয়েছে যার দ্বারা পূর্বের শাসনব্যবস্থা উল্টে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে- সে দাওয়াতে মানুষের অংশগ্রহণ সহজ নয়। বর্তমানে আমাদের দাওয়াত কবুল করা শাসনব্যবস্থার সাথে লড়াই করা সমস্ত বিপদকে ডেকে আনার মতো।

এজন্য এই ধরণের দাওয়াতের ফলে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়।

১. সত্যসন্ধানী, সুউচ্চ মনোবলসম্পন্ন মানুষই এই দাওয়াতে 'লাব্বাইক' বলে। এরা নিজেই নিজের উপর মুসিবতের পাহাড় বহন করার জন্য সামনে অগ্রসর হয়। এই শ্রেণী সর্বদা স্বল্পসংখ্যক হয়।

২. দ্বিতীয় শ্রেণী তারা যারা নেতৃত্বের আসনে থাকে অথবা যারা প্রচলিত ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এই শ্রেণী এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে ও এটাকে নির্মূল করার জন্য মাঠে নেমে আসে।

৩. তৃতীয় শ্রেণী, যারা স্বাভাবিক জীবনযাপনে নিমজ্জিত। এদের অনেকেই হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার ইচ্ছা রাখে এবং হকের সাথে থাকতে আগ্রহী। কিন্তু তাদের ক্ষমতাসীনদের ভয় প্রবল। এজন্য অনেক লাভকে ছেড়ে দেয়া এবং বহু ক্ষতি গ্রহণ করতে তাদের মন তৈরি হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলন শক্তিশালী না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে এই আন্দোলনকে গ্রহণ করার জযবা তৈরি হয় না। তারা অবস্থা পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকে। যখন এই আন্দোলন শক্তিশালী হওয়া শুরু করে তখন এই শ্রেণী দলে দলে সাহায্য করা ও সমর্থন দেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়।

এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত ও তার দাওয়াতি কাফেলার ইতিহাস। যতক্ষণ পর্যন্ত মক্কার মুশরিকদের শক্তি খর্ব না হয়েছে ততদিন মুসলমানের সংখ্যা কম ছিলো। এরপর যখন মক্কা বিজয় হল (নসরের প্রথম আয়াত) তখন দলে দলে মানুষ মুসলমান হওয়া শুরু হল (দ্বিতীয় আয়াত)।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় (১) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (২) (সূরা আন-নাসরঃ ১-২)

সুতরাং সংখ্যাধিক্য, সেটা সাধারণ মানুষের হোক বা দ্বীনদার শ্রেণির হোক, তাদের নীরব অবস্থান বা কিছু বিরোধিতা দেখে জিহাদের দাঈ ধৈর্যহীন হবে না। এটা কখনই হয়নি যে, জিহাদি আন্দোলন কঠিন স্তর পার করছে আর সমাজের অধিকাংশ মানুষ তাদের সাথে আছে। সুতরাং আমাদের এই সংখ্যাধিক্যের সাথে

(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)

"ক্ষমাকে গ্রহণ করুন সৎ কাজের নির্দেশ দান করুন এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলুন" এর উপর আমল করতে হবে।

(خُذِ الْعَفْوَ) অর্থাৎ যতটুকু সাহায্য ও কল্যানকামিতা তারা আপনার সাথে করতে পারে কৃতজ্ঞতার সাথে তা গ্রহণ করুন। (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) অর্থাৎ দরদের সাথে দাওয়াত, ইসলাহ, উৎসাহদান ও দিকনির্দেশনার কাজ চালু রাখুন। দলিল প্রমাণের মাধ্যমে তাদের বুদ্ধিকে কাবু করুন। তাদের মধ্য থেকে যারা (জবান ও কলম দ্বারা)মূর্খতা প্রকাশ করে তাদেরকে এড়িয়ে যান। আপনার জ্ঞান, বুদ্ধি, অস্ত্র যেন কুফুরী শাসনব্যবস্থা নির্মূল করায় ব্যয় হয়। অন্য কাজে যেন সময় নষ্ট না হয়।

জিহাদি আন্দোলনের রাস্তায় আসল বাঁধা

আমরা এটা মানছি যে, দ্বীনদার নেতাদের এক শ্রেণী খুব দুনিয়াদার। এটাও মানছি যে, সমষ্টিগতভাবে এই দ্বীনী রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ সঠিক নয়। তাদেরই কারণে কুফুরী শাসনব্যবস্থা শক্তি পাচ্ছে। তাগুতি শাসনব্যবস্থা তাদেরকে ইসলামের বিপক্ষে ব্যবহার করছে। এবিষয়ে সবাই একমত। রোগ নির্ণয়ে মতবিরোধ নেই, প্রশ্ন হলো চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে।

যদি আপনি এই সেক্যুলার, দ্বীনের দুশমন শ্রেণী, জালিম রাষ্ট্রের অস্ত্রধারী রক্ষীবাহিনীকে ছেড়ে- এই দ্বীনদারদের হিসাবনিকাশ শুরু করেন, তাদের বিরুদ্ধে কুফুরির ফতোয়া খুঁজতে থাকেন - তাহলে এটা চিকিৎসা নয়, বরং রোগবৃদ্ধি। এই শ্রেণী বর্তমান সময়ে জিহাদি আন্দোলনের পথে আসল বাঁধা নয়। এরা নিঃশেষ হয়ে গেলেও আপনার কাজ শেষ হবে না।

এখানে আসল বাঁধা হলো- ঐ সকল ধর্মহীন নেতারা যারা অস্ত্র, জুলুম ও নিজেদের ভাড়া করা খুনিদের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করছে। এরাই বন্দুক উঁচিয়ে সাধারণ মানুষকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। কুফর নেফাকের চিহ্নধারী শাসকশ্রেণী, টাকা পয়সার গোলাম জেনারেলরা এবং মুসলমানদের হত্যাকারী এই ভাড়াটে খুনিরা - এমন এক ক্ষত, যাদের অস্তিত্বের কারণেই - সমস্ত ফাসাদের মূল এই কুফুরী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে। এরাই ঐ ধোঁকাবাজ শ্রেণী যারা এসমস্ত দ্বীনদারদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে। এই দ্বীনের শত্রুরা চায় আমরা দ্বীনদার শ্রেণীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকি, তাতে তারা বেঁচে যায়। এরপর তারা দ্বীনদারদের মাঝে অনৈক্য দেখিয়ে দ্বীনকেই দোষারোপ করে। তারা প্রোপাগান্ডা ছড়ায়- ধর্মই যত সমস্যার মূল, এজন্যই দ্বীনদাররা ঝগড়ায় লিপ্ত। অর্থাৎ এক তীরে দুই শিকার হয়ে যায়।

এমন অবস্থা হলে তো আমাদের দাওয়াত বদ-দ্বীন নয়, দ্বীনদারদের হাতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমরা যতই এই দ্বীনদারদের বিরুদ্ধে ফতোয়া লিখবো - তাদের বিরুদ্ধে ঝগড়ার ময়দান গরম করব - ততই আমাদের দাওয়াত অস্পষ্ট হতে থাকবে এবং আমরা লক্ষ্য থেকে দূরে সরতে থাকবো। এরপর আমাদের আন্দোলন খুব দ্রুত একাকীত্বের শিকার হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তাই আমরা এই দ্বীনদারদের সাথে ফতোয়ার ভাষায় কথা বলব না, দাওয়াতের ভাষায় কথা বলবো। হুমকি-ধমকি, অপদস্থকরণ, গালি-গালাজ নয়, বরং দলিল-প্রমাণ, দরদ-ব্যথার সাথে দাওয়াত দেয়া শিখে নিব। আর এর শরয়ী আহকামও জেনে নেয়া জরুরী, যাতে নিজেদের থেকে ইতেদাল না ছুটে না যায়।

আইএস থেকেও নিকৃষ্ট চিন্তা: জিহাদের দাঈর করণীয়:

দ্বীনী রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ দ্বীনদার। তাদের সাথে কয়েক বিষয়ে আমাদের ঐক্য রয়েছে। আর কয়েক বিষয়ে

মতবিরোধ আছে। তাদের মধ্যে ভালোও আছে খারাপও আছে। সেক্যুলার দলগুলোর তুলনায় তারা আমাদের মিত্র। প্রতিপক্ষ নয়। ধর্মহীনদের তুলনায় তাদের ও আমদের অনেক বিষয়ে মিল আছে। আর দাঈর তো চাহিদাই থাকে মিল থাকা বিষয়কে তালাশ করা। তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে বাতিল বিষয়কে বাতিল প্রমাণ করা। তারপর যোগ্যতা ও আখলাকের বিচারেও এই দ্বীনদাররা সবাই এক কাতারে নয়।

আমি আবারও বলছি, প্রচলিত শাসনব্যবস্থার কথা হচ্ছে না। এটা তো কুফুরী। এই ব্যবস্থায় শরয়ী তাবিলের ভিত্তিতে ইসলামের নামে যারা এতে অংশগ্রহণ করে তাদের কথা বলছি। এরা কি কাফের? নাউজুবিল্লাহ! কখনও নয়। তাদের শরয়ী হুকুম উলামায়ে জিহাদ বর্ণনা করেছেন। এই দ্বীনদার শ্রেণীকে কাফের বলা, সাধারণ মানুষকে ভোটের কারণে কাফের বলা অথবা হিলা-বাহানার দ্বারা মুসলমানের জান-মালকে জায়েজ বানানো বড় ধরনের বাড়াবাড়ি। আর এটা ঐ তাকফিরী চিন্তা, যা আলজেরিয়া থেকে শাম, ইরাক পর্যন্ত জিহাদি দাওয়াতকে ধ্বংস করেছে। এই চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যারা মুখে সাধারণ মুসলমানদেরকে বা অন্যান্য দ্বীনদারকে কাফের বলত না। তাদের কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, তাহলে সাধারণ মুসলমানদেরকে মুসলমানই বলত। কিন্তু তাদের কাজ ছিলো পুরোপুরি এই দাবির বিপরীত।

তারা এমন দলান্ধ ছিলো, তাদের দলের বাহিরের সাধারণ মুসলমান তো পরের কথা দ্বীনদার, মুজাহিদদের সাথে পর্যন্ত কাফের বা কমপক্ষে বিদ্রোহী মানুষের মত আচরণ করত। তাদের জীবন, সম্পদ, সম্মানকে খুব হালকা করে দেখত। নিজেদের বানানো তাবীল দ্বারা তাদের জান মাল নিজেদের জন্য বৈধ করে নিত। কেন? কারণ কি ছিল?

কারণ শুধুমাত্র নিজের দলে না থাকা। অমুক লোক মুসলমান, দ্বীনদার, মুজাহিদও। শরীয়ত তার জান মাল ইজ্জতকে সংরক্ষিত বলে। কিন্তু এই লোকেরা শুধুমাত্র এই কারণে তাকে সহ্য করে না যে - সে তাদের দলে নেই কেন? কেন সে আমার গ্রুপকে শক্তিশালী করে না?

এই চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিরা সর্বদাই দাওয়াত ও জিহাদের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ আছে যারা নিজেদেরকে আইএস বলে না, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সাথে মিশে থাকে। শুধু মাত্র মিশে থাকার দ্বারা কি হয়?

এই চিন্তা চেতনা 'আহলুস সুন্নাহ'র না। এই চেতনাই জিহাদের অনেক বদনাম করেছে। বাস্তবতা হলো আইএস হওয়া কোন বিশেষ দলের সদস্য হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত না। এটা চিন্তা-চেতনা, আমল, আখলাক, কীর্তির নাম। যদি কোন ব্যক্তি দলগতভাবে আইএস নাও হয়, কিন্তু তার চিন্তা চেতনায় গুলু থাকে – আহলুস সুন্নাহ ও বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ জিহাদি আলেমদের থেকে তার মানহাজ ভিন্ন হয় - নফসের পূজা, দলান্ধতা এবং নফসের অনুসরণে লিপ্ত হয় এবং হিলা বাহানায় মুসলমানের জান-মাল বৈধ করে নেয়, তাহলে সে যতই আই-এসের বিরোধিতা করুক না কেন, সে প্রথম স্তরের আইএস। বরং বাস্তবতা হলো এসমস্ত লোক জিহাদি আন্দোলনের জন্য আইএস থেকেও ভয়ঙ্কর।

কারণ আই-এসের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন আইএস শব্দটি ফাসাদকারী অর্থে ব্যবহার করা হয়। আর তারা এখন নিঃশেষের পথে। অথচ এই লোক নিজেকে আই-এসের বিরোধী বলেও কথা ও কাজ দ্বারা দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষতি করছে। সুতরাং আইএস যেভাবে জিহাদের ক্ষতি করেছে, তেমনি গুলুর শিকার চিন্তা-চেতনাও জিহাদের দুশমনদের কম খেদমত করেনি।

সুতরাং জিহাদি আন্দোলনকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার জন্য গুলুর শিকার এই চিন্তা-চেতনা, আখলাক ও মানহাজকে জানতে হবে। এটি একটি অকল্যাণ, আর কল্যাণের উপর আমল করার জন্য অকল্যাণের জ্ঞান থাকা ওয়াজিব। সুতরাং এই মানহাজকে চেনা, তার থেকে দূরে থাকা, মুসলিম যুবকদের এর থেকে দূরে রাখা জিহাদের দাঈ ও মুজাহিদদের জন্য ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কোন বিষয়ে আমল করার জন্য সে বিষয়ে ইলম অর্জন করা ওয়াজিব, নতুবা আল্লাহ না করুন আমাদের মধ্য থেকে কেহ ঐ দলে চলে যেতে পারে; যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿103﴾-
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

বলে দেন আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কারা আমলের দিক থেকে একদম ক্ষতিগ্রস্ত। যাদের কাজ দুনিয়াতে নষ্ট হয়ে গেছে আর তারা ধারণা করে তারা ভালো কাজ করছে।
(সূরা কাহাফ আয়াত নং ১০৩-১০৪)

তাকফীর ও তুচ্ছ করা ছাড়াও সমালোচনা ও সংশোধন সম্ভব:

মাসআলা হলো; এই কুফুরী শাসনব্যবস্থায় শরয়ী তাবীলের মাধ্যমে, দ্বীনের খেদমতের নামে কেউ যদি অংশ গ্রহণ করে তাহলে জিহাদের আলেমদের মতে এটি বাড়াবাড়ি, গুনাহের কাজ এবং হারাম। তার পুরোপুরি বিরোধিতা করা হবে, এবং দাওয়াতের ভাষায় এই ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করা হবে। কিন্তু তাদেরকে কাফের বলা হবে না। এই ব্যক্তিরা সবাই এক স্তরের নয়। কোন বিশেষ নেতা এমনও থাকতে পারে, যে দ্বীন ও জিহাদের ক্ষতি করায় অনেক অগ্রসর অথবা তার ব্যক্তিগত কোন কাজ তার ঈমানের দাবির বিপরীত - কিন্তু তাসত্বেও ঐ ব্যক্তিকে কাফের ফতোয়া দেয়া থেকে আমাদের ভাষাকে সংযত করব। তার বিরুদ্ধে এই ধরণের ফতোয়া দেয়া জিহাদের দাওয়াতের জন্য ক্ষতির কারণ।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পূর্ববর্তী আলেমগণ সর্বদা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গ্রুপকে কাফের ফতোয়া দেয়ার পূর্বে দাওয়াতের লাভ-ক্ষতির দিকটি বিবেচনায় রাখতেন। যদি কোন

ব্যক্তি ইসলামের পোশাক গায়ে জড়াতো অর্থাৎ মুসলিম দাবী করত অথচ সে কুফুরী গ্রহণ করেছে- তাহলে পূর্ববর্তী আলেমগণ দেখতেন তাকে স্পষ্ট কাফের ফতোয়া দেয়া বা হত্যা করা দ্বারা দাওয়াতের ক্ষতি হবে নাকি লাভ হবে। যদি ক্ষতি হওয়ার আশংকা বেশি থাকত তাহলে নাম ধরা ছাড়া তার সমালোচনা হত। সংশোধনের চেষ্টা করা হত। তার খারাবী বন্ধ করে দেয়া হত। কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট করে তাকফিরও করা হত না। তাকে হত্যা করাও হত না।

আব্দুল্লাহ বিন উবাই দরঈসুল মুনাফেকীনের সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণের দিকে লক্ষ করি। সাহাবীগণ যখন বললেন, "আমরা তাকে হত্যা করি?" তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তাকে ছাড়, মানুষ বলবে মুহাম্মদ তার সাথীদের হত্যা করে।"

আরেকটি বিষয় লক্ষ করি - ইবনে উবাই আনসারিদের খাজরাজ গোত্রের ছিল। এক গোত্র হওয়ার কারণে খাজরাজের সরদার হযরত সাআদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবী হওয়া সত্বেও এটা সহ্য করেননি যে, অন্য গোত্রের কোন লোক তাকে(ইবনে উবাইকে) হত্যা করবে। এই কারণেই আউস গোত্রের সরদার হযরত সাআদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, তখন সাআদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার উপর রাগ করলেন এবং এমন কাজ করতে নিষেধ করলেন।

এই ঘটনা মুসলিম শরিফের মধ্যে এসেছে। সেখানে আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর একটি কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "সাআদ বিন উবাদা ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু ঐ সময় তার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠেছিল। তিনি চাচ্ছিলেন যদি হত্যা করার আদেশ দেয়া হয় তাহলে যেন তাদেরকে আল্লাহর রাসুল আদেশ দেন। তারাই ইবনে উবাইকে হত্যা করবে। অন্য গোত্রের কেউ হত্যা করবে এটা তারা চাচ্ছিলেন না। ঠিক এমন কথাই বলেছিলেন ইবনে উবাই এর মুসলমান ছেলে 'আব্দুল্লাহ' রাদিয়াল্লাহু আনহু।

যখন ইবনে উবাই এর খারাবী বেড়ে গেলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্টের বিষয়টি তিনি বুঝতে পারলেন, তখন তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ!যদি আমার পিতাকে হত্যা করতে চান তাহলে আমাকে আদেশ করুন। আমিই তার মাথা এনে আপনার সামনের রাখব। কিন্তু অন্য কেউ হত্যা করলে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগবে"।

সম্মানিত ভায়েরা!

বংশীয় এবং দলীয় সম্পর্ক খুব নাযুক। নিজের দলের কোন নেতার সাথে দলের কোন সদস্যের মতবিরোধ থাকতে পারে - কোন এক পর্যায়ে সে তাকে খারাপও মনে করতে পারে। কিন্তু দলের বাহিরের কেউ ঐ নেতার নামে কোন খারাপ কথা বললে তার দলীয় অনুভূতি জেগে উঠে। বিশেষ করে দলটি যখন দ্বীনী দল হয় তখন অনুভূতিও তীব্র হয়। তাই এই নাজুকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।

এই দ্বীনী দলের মধ্যে ভালো মানুষও আছে। তারা তাদের নেতাদের ভালোবাসে নেতাদের দুনিয়া পূজার কারণে নয়, বরং নেতাদের দ্বীনী খেদমতের কারণে বা দ্বীনী খেদমতের ওয়াদার কারণে। সুতরাং এই নেতাদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে আমরা কীভাবে ধারণা করতে পারি যে, তার দলের লোকেরা আমাদের কথা শুনবে? আর তাদেরকে কাফের ফতোয়া দেয়ার দ্বারা অন্য দ্বীনদার ও জনসাধারণকে মোটেও প্রভাবিত করা যায় না।

সুতরাং আপনি যদি চান যে, তাদের এই রোগের চিকিৎসা করবেন, তাদেরকে গণতন্ত্রের কুফুরী বুঝাবেন, তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে নববী মানহাজে নিয়ে আসবেন, তাদেরকে এই খারাপ পথ থেকে ফিরাবেন, তাহলে সিরাতের অনুসরণ করুন। কাজের সমালোচনা করুন। কারো নাম উল্লেখ ব্যতীত, কাউকে কাফের ফতোয়া দেয়া ব্যতীত গণতন্ত্রের ভ্রান্ত হওয়ার দলিলাদি বর্ণনা করুন।

মানুষ তাদের কথা মানবে না আমাদের কথা মানবে?

লাল মসজিদ ট্রাজেডির পর যখন সব মুজাহিদরা দুঃখিত ও মনকষ্টে ছিলো, তখন আমাদের মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত কিছু ভাই পাকিস্তানের এক বড় মুফতি সাহেবের ফটো নেতিবাচক ভাবে প্রকাশ করেছিল। মুফতি সাহেবকে কাফের (নাউজুবিল্লাহ) ফতোয়া দেয়া হয়নি- ভদ্র ভাষায় কিছু সমালোচনা করা হয়েছিল ।

শায়খ আবু ইয়াহইয়া রহ. কে আমি এই ভিডিওটি দেখালাম। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "এই ছবি কেন লাগিয়েছে"? আমি বললাম, "মুফতি সাহেব লাল মসজিদের ব্যাপারে এই মতামত পেশ করেছেন। তাছাড়া তিনি এই করেছেন সেই করেছেন ইত্যাদি"। তিনি বললেন: "আপনাদের এই কাজ সম্পূর্ণ ভুল"। তারপর তিনি বললেন: "এই মুফতি সাহেবের কত ভক্ত আছে? কত মানুষ তার জুমায় উপস্থিত হয়? স্পষ্টত লাখো মানুষ তাকে নিজেদের মুরুব্বি মনে করে। আর আপনার আমার কথা শোনার লোক কতজন? কতজন মানুষ আমাদের বলার দ্বারা এই মুফতি সাহেবকে খারাপ বলবে? আর কতজন মানুষ তার বলার দ্বারা আমাদেরকে খারাপ বলবে?

সাধারণ দ্বীনদার জনগণ আপনার তাকওয়া, জিহাদ, ইলম সম্পর্কে কিছুই জানে না। আপনি কে আপনার মর্যাদা কি তাও জানে না। কিন্তু আপনি যখন এমন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে খারাপ বলবেন যাকে তারা সম্মান করে, তাহলে শুধু আপনার বলার দ্বারা তারা তাকে কেন খারাপ বলা শুরু করবে? এরপর যদি ঐ মুফতি

সাহেব আপনাদেরকে খারেজী বলে তাহলে তারা কেন আপনাকে খারেজী বলবে না? লোকেরা আপনাদের মাধ্যমে তাদেরকে চেনে না, বরং তাদেরকে দিয়ে আপনাদেরকে চেনে। সুতরাং তারা আপনাদের ব্যাপারে যা বলবে লোকেরা তাই মেনে নেবে”।

তারপর শায়খ দ্বীনী রাজনৈতিক নেতাদের ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলেন: “ জনসাধারণের কাছে প্রসিদ্ধ এমন নেতাদের নাম উল্লেখ করে বা ছবি দিয়ে কোন সমালোচনা, দোষারোপ করা যাবে না। যদি কোন কারণে ছবি প্রকাশ করতেই হয়, তাহলে কোন প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপ ছাড়াই - যত কম তিক্ত শব্দ ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। তারপর কথার ভঙ্গিতে কোন গোস্বা প্রকাশ না করা বরং কল্যাণকামিতা, সহানুভূতির প্রকাশ থাকা উচিৎ।”

তারপর আমি শায়খকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তাহলে গণতন্ত্রের কুফুরী এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির গোমরাহি কিভাবে বর্ণনা করবে? কিভাবে মানুষের কাছে এই গোমরাহি স্পষ্ট হবে”? শায়খ বললেন: “গণতন্ত্র বিষয়টাকে স্পষ্টভাবে কুফর বলবে, ইসলামী গণতন্ত্র নামের পরিভাষাকে স্পষ্টভাবে বাতিল বলে ঘোষণা করবে। দলীল প্রমাণের মাধ্যমে এই চিন্তা-চেতনার অসারতা প্রমাণ করবে। বলবে- এই সিস্টেমে প্রবেশ করলে কুফুরী শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। এটা বাড়াবাড়ি, গুনাহের কাজ। কিন্তু এই সমালোচনায় নেতাদেরকে কাফের বলবে না। নেতাদের ছবি লাগিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা যাবে না। নিজেদেরকে ভাল এবং তাদেরকে খারাপ হিসেবে প্রকাশ করবে না। তাদের সাথে যদি কঠোর আচরণ, ঠাট্টামূলক কথাবার্তা বলা হয়, তাহলে তাদের অনুসারীরা স্বজনপ্রীতিতে পড়ে যাবে। আপনাদের কথায় কান দেবে না। এবং তাদের বিরোধিতা শত্রুতায় পরিণত হবে।

জিহাদের দাঈ ভায়েরা!

এই সমস্ত দল ও ব্যক্তিবর্গের সাথে দলিল-প্রমাণের সাহায্যে ও দরদ-ব্যথা সহকারে মতবিরোধ হোক। তাদের প্রমাণাদি, কাজের পদ্ধতিরও খণ্ডন হোক। কিন্তু এই সমালোচনা তাকফিরের ভঙ্গিতে না হোক। বরং দরদের সাথে বুঝানোর জন্য হোক। তাছাড়া আরো একটি বিষয় হলো - যেই দ্বীনদাররা আমাদের বিরোধিতা করে, তাদের নিয়তের উপর আঘাত করব না। শুধু তাদের কাজ ও আমলের সাথে মতবিরোধ করব।

আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় হলো - কোন ব্যক্তিকে যদি আপনি খারাপ মনে করেন, কিন্তু আপনার শ্রোতারা তাকে ভালো মনে করে এবং দ্বীনের খাদেম মনে করে - তাহলে আপনার খারাপ বলার দ্বারা, কাফের ফতোয়া দ্বারা আপনার কথা আপনার শ্রোতারা কখনও মানবে না। তাকে খারাপ না বলে তার খারাপ কাজকে খারাপ বলুন। দলিল-প্রমাণ, দরদ-ব্যথা ও বিনয়ের সাথে ঐ বিষয়টি খারাপ হওয়া প্রমাণিত করুন। তাহলে শ্রোতারাই তাকে খারাপ বলা শুরু করবে, তার খারাবির বিরোধিতা করবে।

অনুবাদ: আহনাফ সাকের

(দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত)
চলবে ইনশা আল্লাহ...





“আর নিশ্চয় আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে”

আল্লাহর বিজয়ী বাহিনীর কতিপয় গুণাবলী

শাইখ মুজাহিদ আবু ইয়াহইয়া আল জাযায়িরী

আল্লাহর বিজয়ী বাহিনীর কতিপয় গুণাবলী
(হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকেও তাদের দলভুক্ত করুন।)

(১) অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করা। কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং তার মুখাপেক্ষী হওয়া। তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা। আমল ও অনুসরণের নিয়্যাতে কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহর জন্য করা তাদের সুন্দর ইবাদতসমূহের অন্যতম।

(২) তারা আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে। আর তাদের আদর্শ হল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার দ্বীনি ভাই - নবী রাসূলগণ। তারা আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করে, তাদের প্রভুর কাছে দোয়া করে, বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর দ্বীনের উপর অবিচল থাকে। তারা কোন তাড়াহুড়ো, হতাশা ও সংশয় ছাড়া একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস রাখে।

(৩) তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল- সত্য কথা বলা। আল্লাহ তা'আলার সাথে ও মানুষের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা।

(৪) তাদের আরো একটি গুণ হল, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলোকে নামাযের কাতারে ও জিহাদের কাতারে সারিবদ্ধভাবে জমা করে দিয়েছেন। তারা যেন সুদৃঢ় সীসাঢালা প্রাচীর। তারা সকল প্রকার পঙ্কিলতা মুক্ত আত্মার অধিকারী। এইসব আত্মা রিয়া ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, হিংসা-বিদ্বেষ হতে নিরাপদ। তারা মুমিনদের প্রতি সদয় এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর।

(৫) তাদের আরো একটি গুণ হল, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তা'আলার শিয়ারগুলোর (নিদর্শনসমূহের) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

আর পরবর্তীদের মধ্যে তার জন্য (সুখ্যাতি) রেখে দিয়েছি।
(সূরা আস-সাফফাত - ৭৮, ১০৮, ১২৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

শান্তি বর্ষিত হউক রাসূলদের প্রতি।
(সূরা আস-সাফফাত - ১৮১)

(৬) তারা দলিল-প্রমাণ সহ আত্মপ্রকাশ করে। তারা পথভ্রষ্ট নেতাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সামরিক আক্রমণের সাথে সাথে মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণকেও প্রতিহত করে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

“আর প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে হিফাযত করেছি। ফলে

তারা ঊর্ধ্বজগতের কিছু শুনতে পারেনা, কারণ প্রত্যেক দিক থেকে তাদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় (উল্কাপিণ্ড) তাড়ানোর জন্য, আর তাদের জন্য আছে অব্যাহত আযাব।”

(সূরা আস-সাফফাত: ৭-১০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।” (সূরা আস-সাফফাত - ৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“হে নবী! আপনি কাফের ও মুনাফেকদের সাথে যুদ্ধ করুন। এবং তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা নিকৃষ্ট আবাসস্থল।”(সূরা আত-তাওবা - ৭৩)

সুতরাং সক্ষমতা থাকা কালে তরবারি ও কিতালের মাধ্যমে কর্তৃত্ব ও বিজয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তাছাড়া সাহায্যপ্রাপ্ত দলের আরেকটি নমুনা হচ্ছে তারা সংখ্যায় কম হয়েও টিকে থাকবে। তাদের শত্রু, বিরোধিতাকারী ও সমালোচনাকারী সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাদের কিছু করতে পারবে না। এটা আল্লাহ সাহায্য ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহর দ্বীনের উপর অবিচল থাকা, জিহাদের উপর ও যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ় থাকা এই দলটির আরেকটি গুণ। এই দলটিই জমিনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও জুলুম প্রতিহতকরণের সুন্নাহ বাস্তবায়ন করেছে এবং অংশগ্রহণ করা প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে। আর এই সাহায্য তখনই এসেছে যখন তারা আবশ্যক কর্তব্যগুলো পালন করেছে এবং গুনাহ থেকে দূরে থেকেছে।

আর আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউসুফের মাঝে ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রাসাদে প্রবেশকে ‘ক্ষমতা প্রদান’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা তিনিই তাঁকে ফিরিয়ে এনেছেন। (আল্লাহই ভাল জানেন)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“আর মিসরের যে ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, এর থাকার সুন্দর সম্মানজনক ব্যবস্থা কর। আশা করা যায়, সে আমাদের উপকার করবে অথবা আমরা তাকে সন্তানরূপে গ্রহণ করব। এভাবেই আমি ইউসুফকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই। আল্লাহ নিজ কর্ম সম্পাদনে প্রবল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।” (সূরা ইউসুফ - ২১)

বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ‘ইবাদতের অধিকার একমাত্র আল্লাহর’- এই জ্ঞান, দ্বীনী বুঝ ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরতে শুরু করেছে। আল্লাহ যদি চান তবে এটা পরিপূর্ণ তামকীন তথা বিজয়ের পূর্বাভাস।

(৭) তারা ইবাদাত ও লেনদেনের ক্ষেত্রে, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে, যুদ্ধ, সন্ধি, কিংবা আখলাকের ক্ষেত্রে কুরআন- সুন্নাহর অনুসরণ করে।

তারা কুরআনে কারীম ও রাসূলের পবিত্র সুন্নাহ এর উপড় কোন কিছুকে প্রাধান্য দেয় না। উম্মাতের সালফে সালিহীন ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের বুঝ এর উপর প্রবৃত্তির অনুসরণকে প্রাধান্য দেয় না। এ ক্ষেত্রে তারা অধিকাংশকে সন্তুষ্ট করার জন্য অথবা আবেগে বা কাল্পনিক কোন মাসলাহাতে, অন্ধ অনুকরণে, নেতা বা সর্দারদের কোন নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত হলে সেটা তারা গ্রহণ করেনা।

লক্ষ্য করুন, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কীভাবে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং স্বজাতির বিরুদ্ধে দলিল কায়েম করেছিলেন! অথচ তিনি ছিলেন একা। ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

আর সুস্পষ্ট পরীক্ষার পরেই আসে সাহায্য ও সক্ষমতা। যদিও জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ চাইলে তা খুব নিকটেই। আর কষ্টের পরেই আসে আনন্দ। আল্লাহ তা'আলা সকল সীমালঙ্ঘনকারীদের ধ্বংস করে দিন। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।

প্রিয় ভাই!

আপনি এই গুণগুলো সূরা আস-সাফফাত এর মাঝে পাবেন। আল্লাহ তা'আলা সূরাটির শুরুতে ও শেষের দিকে ফেরেশতাদের বেশ কয়েকটি গুণ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন তারাও দয়াময় আল্লাহর বান্দা ও তাঁর বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত। আর সূরাটির মাঝামাঝিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচনা করেছেন- তাঁর প্রেরিত বান্দা রাসুলদের দাওয়াত, ধৈর্য ও তাদের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে। আল্লাহ তা'আলা তাদের শেষ পরিণতি কেমন করেছেন সেটাও এখানে বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এই সূরাতে দশ জন রাসুলের দাওয়াতের আলোচনা করেছেন। তারা হলেন- আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নূহ আলাইহিস সালাম, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর দুই ছেলে ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিস সালাম, মুসা ও হারুন আলাইহিস সালাম, ইলিয়াস, লূত ও ইউনুস আলাইহিস সালাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا

“শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো।”

(সূরা আস-সাফফাত: ১)

অর্থাৎ ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের কাছে সারিবদ্ধ হয়ে

দাঁড়ায় এবং তারা নামাযের মাঝে একত্র হয়।

فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا

"অতঃপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের।"
(সূরা আস-সাফফাত: ২)

অর্থাৎ ফেরেশতারা যখন কাফেরদের রূহ কবজ করে তখন ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শন করে।

فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا

"অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের।"
(সূরা আস-সাফফাত - ৩)

অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার কিতাব তেলাওয়াত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ

"আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট স্থান।"
(সূরা আস-সাফফাত: ১৬৪)

অর্থাৎ আসমানে এক বিগত পরিমাণ জায়গাও এমন পাওয়া যাবে না যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা দাঁড়ানো অথবা সেজদারত নেই।

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ

"এবং আমরাই সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান থাকি।"
(সূরা আস-সাফফাত: ১৬৫)

অর্থাৎ ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের কাছে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় এবং প্রথমে প্রথম কাতার তারপর দ্বিতীয় কাতার এভাবে কাতার পুরা করে।

وَإِنَّالَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ

"এবং আমরাই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করি।"
(সূরা আস-সাফফাত: ১৬৬)

অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ পবিত্রতা ঘোষণা হয় আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে।

وَإِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ

"তারা তো বলত" (সূরা আস-সাফফাত: ১৬৭)

অর্থাৎ যারা কুফরি করেছে।

لَوْ أَنَّ عِنْدَنَاذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ* لَكُنَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ* فَكَفَرُوابِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

"যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের কোন উপদেশ থাকত, তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহর মনোনীত বান্দা হতাম। বস্তুত তারা এই কুরআনকে অস্বীকার করেছে। এখন শীঘ্রই তারা জেনে নিতে পারবে।" (সূরা আস-সাফফাত: ১৬৮-১৭০)

এখানে ঐ ব্যক্তির নিন্দা রয়েছে যে এমন কথা বলে যা সে করে না। ঐ ব্যক্তির প্রতি ধমকি রয়েছে যে কুফরি করেছে ও কুরআনে আজিমের প্রজ্ঞাময় উপদেশ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ *إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

"আমার রাসুল ও বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী।" (সূরা আস-সাফফাত: ১৭১-১৭৩)

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেকে, আমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে এবং মুমিনদেরকে আপনার সাহায্যপ্রাপ্ত বান্দাদের অনুসারী বানান। এবং আপনি আমাদেরকে আপনার বিজয়ী দলের অন্তর্ভূক্ত করুন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা সূরা আস-সফ এর মাঝেও এধরনের গুণ উল্লেখ করেছেন,

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ *كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ * إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ * وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ক্রোধের বিষয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। আর মূসা যখন তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? অথচ তোমরা নিশ্চয় জান যে, আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তারা যখন বাঁকাপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়গুলোকে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" (সূরা আস-সফ: ১-৫)

সূরা আস-সফ এর মাঝে আল্লাহ তা'আলা তিন জন রাসূল তথা মূসা আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা আলোচনা করেছেন। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের কথা এবং তার কর্তৃক আহমদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) ব্যাপারে তাঁর সুসংবাদের কথা বলেছেন। ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর সঙ্গীদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, "তারা আল্লাহ পথে তাঁর সহযোগী হবে"। একথাও এই সূরাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জানিয়েছেন।

এছাড়াও এসেছে আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন এবং মুমিনদেরকে শক্তিশালী করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা আস-সফ: ৯)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

"অতঃপর যারা ঈমান আনল আমি তাদেরকে তাদের শত্রুবাহিনীর উপর শক্তিশালী করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হল।"
(সূরা আস-সফ: ১৪)

সূরা আস-সফ এর মাঝে আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঈসা আলাইহিস সালামের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ কর্তৃক মুমিনদেরকে বিজয়দান করার আলোচনা এসেছে। এছাড়া সূরা আল-ইমরানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম ও ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"স্মরণকর, যখন আল্লাহ বললেন, "হে ঈসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে পরিগ্রহণ করব, তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব। আর যারা তোমার আনুগত্য করেছে তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপরে প্রাধান্য দেব।" (সূরা আল ইমরান: ৫৫)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস উপরের আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করে (আল্লাহই ভালো জানেন)। হাদিসটি হচ্ছে -

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - قَالَ - فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (صلى الله عليه وسلم) فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ لاَ. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةَ

আমার উম্মাতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে। তিনি আরো বলেন, অতঃপর ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন। তখন তাদের আমীর বলবে, আসুন! আমাদের নিয়ে নামায পড়ান। ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, না! নিশ্চয় তোমাদের কতককে কতকের আমির বানিয়ে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে সম্মানিত করেছেন। (সহীহ মুসলিম, ৪১২) (হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন)।

ঈসা আলাইহিস সালাম অচিরেই দামেস্কে অবতরণ করবেন(আল্লাহ দামেস্ক বিজয় ত্বরান্বিত করুন, আমিন)। তার অবতরণ এমন অবস্থায় হবে যে, ফজরের নামাযের ইকামত দেওয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের কাতারগুলো সুবিন্যস্ত। আর তারা ফজরের নামাযের পরেই আল্লাহর রাস্তায় চলে যাবে। মুসলমানরা ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। মুসলমানদেরকে ইয়াহুদীদের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হবে। ফলে পাথর, গাছ ডেকে বলবে, "হে মুসলমান! হে আল্লাহর বান্দা! এই তো আমার পেছনে একজন ইয়াহুদী। এসো, তাকে হত্যা কর!!" আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল ঈসা আলাইহিস সালামকে তাওফিক দিবেন মাসীহ দাজ্জালকে ফিলিস্তিনের বাবে লুদ (লুদ নামক গেইট)এর নিকটে হত্যা করার।

যখন ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন, তখন তিনি কুরআন–সুন্নাহ মোতাবেক ফায়সালা করবেন। আর এই সবকিছুই আসন্ন, অতি নিকটবর্তী। যদি আমরা সেই যমানা পাই তাহলে তো ভালো। আর যদি না পাই, তাহলে আমরা আল্লাহর কাছে দুয়া করি: তিনি যেন আমাদেরকে ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত করেন যারা এর জন্য সুসংগঠিত হচ্ছে। আমরা আরও দুয়া করি: আমরা যেন আমাদের পরবর্তীদের কাছে পতাকাটি হস্তান্তর করতে পারি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌছায়।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে, আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে, আমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে, আমাদের ভাইদেরকে, সকল মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের সাহায্যকারী বানিয়ে দিন।

খায়বার যুদ্ধের সময় ফজরের নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা আস- সাফফাত পাঠ করে খায়বারের ইয়াহুদীদের উপর এই বলে আক্রমণ করেছিলেন যে, "আল্লাহু আকবার! খায়বার ধ্বংস হোক। নিশ্চয় আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙ্গিনায় অবতরণ করি, তখন - যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকালটি হবে খুবই মন্দ"। একই ভাবে ফজরের নামাযের সময় ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ করবেন ও নামাযের পর মুসলমানরা ইহুদীদেরকে ও দাজ্জালকে হত্যা করবে। এই দুই ঘটনার মধ্যে কি অদ্ভুত মিল। একবার চিন্তা করে দেখুন!!

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا

"অতঃপর শপথ প্রভাতে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের।"

(সূরা আদিয়াত: ৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ * وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ * أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ *فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ * وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ * وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ * سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"অতএব কিছুকাল পর্যন্ত আপনি তাদের থেকে ফিরে থাকুন। আর তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করুন, অচিরেই তারা দেখবে (এর পরিণাম)। তারা কি আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চায়? আর যখন তা তাদের আঙ্গিনায় নেমে আসবে তখন সতর্ক কৃতদের সকাল কতইনা মন্দ হবে! অতএব আপনি কিছুকালের জন্যে তাদেরকে উপেক্ষা করুন। (১৭৪) এবং তাদেরকে দেখতে থাকুন। শীঘ্রই তারাও এর পরিণাম দেখে নেবে। (১৭৫) আমার আযাব কি তারা দ্রুত কামনা করে? (১৭৬) অতঃপর যখন তাদের আঙ্গিনায় আযাব নাযিল হবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ। (১৭৭) আপনি কিছুকালের জন্যে তাদেরকে উপেক্ষা করুন। (১৭৮) এবং দেখতে থাকুন, শীঘ্রই তারাও এর পরিণাম দেখে নেবে। (১৭৯) পবিত্র আপনার পরওয়ারদেগারের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। (১৮০) পয়গম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১৮১) সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর নিমিত্ত। (১৮২)" (সূরা আস-সাফফাত: ১৭৪-১৮২)

কোন এক ইহুদী মন্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন- মুসলমানরা যখন জুমার নামাযের ন্যায় ফজরের নামাযের জন্য একত্র হয়, তখন আমাদের অন্তরসমূহে তাদের ভয় ঢুকে যায়।

শায়খ আবু ইয়াহইয়া আল জাযায়িরী
(আল্লাহ তা'আলা তাকে, তাঁর পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন)
২১ শে শাওয়াল ১৪৪০ হিজরী। সোমবার, সকাল বেলা।
অনুবাদ: সাফকাত ওয়াসি



নিরাপত্তা কাউন্সিলের বৈঠকের নামে ‘আনন্দ উৎসব’ আর কতদিন পর্যন্ত চলবে?

ওসআ’তুল্লাহ খান

ওসআ’তুল্লাহ খান একজন সেক্যুলার মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি। তিনি বৃটিশ সংবাদ প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান বিবিসির একজন সাংবাদিক। তার আলোচনাধীন বিষয়ের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের ঐ অংশটি প্রয়োগ করা যায় যে, (صدق وهوكذوب “সে মিথ্যাবাদী হওয়া সত্ত্বেও সত্য বলেছে”)।

পাকিস্তানকে সান্ত্বনা জানানোর জন্য বলা যায় যে - কাশ্মীর সমস্যার সমাধান দুই পদ্ধতিতে হতে পারে:

প্রথম পদ্ধতি এই যে, কাশ্মীরীদের বাধা-প্রতিরোধ ইন্ডিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পর্যায়ে এমন প্রভাব ফেলতে হবে যেন তারা নিরাপত্তা মূলক আইন করে কাশ্মীরীদের উপর অত্যাচার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, ইন্ডিয়ার উপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে- কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ- এমন অসহনীয় হয়ে উঠবে যেন তারা দুর্নাম ও পৃথিবীর সাথে সম্পর্কহীনতার ভয়ে কাশ্মীরের কোন সহজ সমাধানের দিকে ফিরে আসে।

পাকিস্তান আশা করছে এই সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ আজও সহযোগী প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, কাশ্মীরের ব্যাপারে নিরাপত্তা কাউন্সিলের সকল প্রস্তাব জাতিসংঘ সনদের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের অধীনে মঞ্জুর করা হয়েছে। এই ধরণের প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য হলো – এগুলো শুধুমাত্র সুপারিশমূলক প্রস্তাব। যদি কোন দল বা দেশ সেই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রস্তাবনা না কার্যকর করে তাহলে জাতিসংঘ তাদের বিরুদ্ধে সংশোধনমূলক শক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনা। ইসরাইলের বিরুদ্ধে মঞ্জুরীকৃত প্রস্তাবটাও এই প্রকারেরই।

যদি এই প্রস্তাবগুলো জাতিসংঘ সনদের সপ্তম পরিচ্ছেদের অধীনে মঞ্জুর করা হতো, তাহলে তা কার্যকর করার জন্য নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি ব্যবহারের অনুমতি থাকত। এমনটা দেখা গেছে ১৯৫০ সালের কোরিয়ার যুদ্ধ থেকে। ইরাক থেকে কুয়েতের দখলমুক্ত করার বিষয়টিও এই ধরণের ছিল।

তৃতীয় পদ্ধতি এই যে, পাকিস্তানের বন্ধু অথবা স্বধর্মীয় রাষ্ট্রগুলো প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে সমর্থন দিবে। অথবা পাকিস্তান যে কোন মূল্যেই এই সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করবে। কিন্তু পাকিস্তান (শক্তি ও প্রভাবের দিক থেকে) আমেরিকাও নয়, চীনও নয় যে, নিজের নিরাপত্তাহীন অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রভাব কিংবা ক্ষমতার জোরে অনেকগুলো দেশকে নিজেদের নেতৃত্বে একত্রিত করতে পারবে।

গত দিনে অবস্থা এক ছিল, কিন্তু আজ অবস্থা ভিন্ন। স্বধর্মীয় দেশ সৌদি আরব কেন কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানকে স্পষ্ট সহযোগিতার ঘোষণা দিবে? অথচ পাকিস্তান তেলটা পর্যন্ত তাদের থেকে ধার নেয়। পক্ষান্তরে ইন্ডিয়া তার বিপরীতে বার্ষিক ২৮ বিলিয়ন ডলারের সৌদি তেল ক্রয় করে থাকে।

সৌদি যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান সামনের দুই বছরে ইন্ডিয়াতে একশত (১০০) বিলিয়ন ডলারের পুঁজি বিনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কাশ্মীরের বিশেষ মালিকানা মর্যাদা বাতিল হওয়ার পর পরই সৌদি তেল কোম্পানি 'আরামকো' ইন্ডিয়ান কোম্পানী 'রিলায়েন্স' এর সাথে পেট্রোলিয়াম ব্যবসার চুক্তি করেছে।

মিত্র দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত পাকিস্তানকে শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য তিন বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে। ইন্ডিয়াতে আমিরাতের ব্যবসার পরিমাণ হলো ৫০ বিলিয়ন ডলার। আর আমিরাতে ইন্ডিয়ার বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ হলো ৫৫ বিলিয়ন ডলার। এজন্য যখন আরব আমিরাত বলে কাশ্মীরের বিষয়টি ইন্ডিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়, তখন চিন্তা হয় কেন? (কারণ তলে তলে উভয়েরই তো মিল আছে)।

নিরাপত্তা কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য চীনের ইন্ডিয়ার সাথে ব্যবসার পরিমাণ হলো একশত (১০০) বিলিয়ন ডলার। তো চীন কেন ইন্ডিয়ার সাথে স্পষ্ট ময়দানে তর্কে জড়াতে চাইবে? চীন তার দাবি কৃত লাদাখ এর মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কঠিন মূল্য পরিশোধ করেছে। কিন্তু কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তান ও ইন্ডিয়াকে চাপ দিয়েছে যে, তারা যেন দুই দিকের সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান বের করে।

নিরাপত্তা কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য রাশিয়া আজও সবচেয়ে বেশি অস্ত্র ইন্ডিয়ার কাছে বিক্রি করছে এবং সামনের বছর তারা পাঁচ বিলিয়ন ডলার অর্থের এস ফোর হান্ড্রেড (s400) মিসাইল সিস্টেম স্থাপন করে দিবে। রাশিয়াও ইন্ডিয়াকে এটাই বুঝিয়েছে যে, উভয় দেশ ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাবে।

ইন্ডিয়ার কাছে রিফাল বিমান বিক্রয়কারী রাষ্ট্র হচ্ছে ফ্রান্স, যে নিরাপত্তা কাউন্সিলের আরেক স্থায়ী সদস্য। নিরাপত্তা কাউন্সিলের আরেক স্থায়ী সদস্য হচ্ছে বৃটেন, সেটাও রাশিয়ার পথ ধরে চলছে।

৫ই আগস্ট এর পর থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এর অবস্থান কি? কেউ জানলে আমাদেরকেও জানাবেন। নিরাপত্তা কাউন্সিলের স্থায়ী দশ সদস্যের কেউই (কাশ্মীর ইস্যুতে) মুখ খুলেনি। তাছাড়া জার্মানি – দক্ষিণ আফ্রিকা – কুয়েত এবং ইন্দোনেশিয়া সহ কোন সদস্য দেশ কি এখন পর্যন্ত একটি শব্দও মুখ থেকে বের করেছে?

কাশ্মীরের সমস্যা নিয়ে নিরাপত্তা কাউন্সিল যদি দেড় ঘন্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কিছু প্রস্তাবনা গ্রহণ করে, এতে কি পাকিস্তান সফল হয়ে যাবে?

এখন নিরাপত্তা কাউন্সিলের বৈঠকের নামে 'আনন্দ উৎসব' আর কতদিন পর্যন্ত চলবে? এবং তারপর কি করতে হবে?

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সহীহ্ দ্বীন বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন।

অনুবাদ: আহমেদ রেজা



আমাদের দেশের সরকারী শিক্ষার সিলেবাস, সরকারী মিডিয়া এবং ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ মানুষদেরকে সর্বদা এটাই বুঝিয়েছে যে, "পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যে আন্দোলন হয়েছিল সেটা ভিন্ন একটি আন্দোলন ছিল। বর্তমানে বেলুচিস্তান, সোয়াতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত, সিন্ধু ইত্যাদি জায়গায় রাষ্ট্র, সেনা সদস্য এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হচ্ছে সেটি কট্টরপন্থী জাতীয়তাবাদীদের আন্দোলন। এই আন্দোলন জাতিগত অথবা ভাষাগত পক্ষপাতিত্বের উপর ভিত্তি করে শুরু হয়েছে। এসকল আন্দোলনকারীরা পাকিস্তানের ক্ষতি করতে চায়।"

একথা সত্য যে, কখনো কখনো শুধু জুলুমে নিষ্পেষিত হয়েই এ সমস্ত আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। যারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ইনসাফের আচল ছেড়ে দিয়েছে তারপরও এটা একটা বাস্তব সত্য যে, বাংলাদেশ এবং বেলুচিস্তানের মত জায়গার আন্দোলনগুলো দ্বারা বহির্শক্তিগুলো নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে। সেইসাথে একটি পক্ষ অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা থেকে ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করছে।

প্রশ্ন হল - অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা সৃষ্টি করার মূল হোতা কারা? কারা এরকম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যার ফলে আমেরিকা বা ভারত ফায়দা হাসিল করার সুযোগ পেতে পারে? অন্যদের দিকে আঙ্গুল উঠানের পূর্বে আমাদের দেশের কারো টুঁটি চেপে ধরতে হবে কি?

বিগ্রেডিয়ার সিদ্দিক সালীকের বয়ানকৃত একটি ঘটনার উপর একটু চিন্তা করুন- কিছুক্ষণ পর সৈনিকদের একটি জিপ আমার কাছে এসে থামল। হাবিলদার আমাকে স্যালুট দিল। পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী এক বাঙ্গালী ছেলেকে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলো, "স্যারের ব্রিফকেস কোন জিপে রেখেছ?"

ছেলেটা এমনিতেই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। হাবিলদারের ধমক খেয়ে আমার দিকেও ঘুরে তাকাল। তার কালো চেহারার কুঠরিতে সাদা সাদা চোখগুলো ভীতিকর মনে হচ্ছিল। ছেলেটা কাচুমুচু হয়ে হুকুম পালন করলো। আমি পকেট থেকে কিছু পয়সা বের করে সেই গরীব ছেলেটিকে দিতে চাইলাম। কিন্তু হাবিলদার উঁচু আওয়াজে বলে উঠল, "স্যার এসকল হারামজাদাদের বদঅভ্যাস বানাবেন না।" আমি তার পরামর্শ মেনে নিলাম। বাঙ্গালী ছেলেটি আরেকবার আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। এয়ারপোর্টের উঁচু উঁচু আকাশচুম্বি ভবনগুলোর উপর তারকারাজি এবং চাঁদ ঝলমল করছিল। আমি নির্ধারিত ছাউনির দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

(সূত্রঃ আমি ঢাকা ডুবতে দেখেছি)

আমরা কি প্রতারণা এবং ধোঁকার শিকার নই? আমাদের সামনেই একটি সংগঠিত প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে একই দেশের একটা অংশকে নিম্নমানের পাকিস্তানি আর বাকিদেরকে উন্নত ও শহুরে পাকিস্তানি বানিয়ে হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা যখন পাকিস্তানের কথা বলি তখন আমাদের 'পাকিস্তান' শব্দ দ্বারা আমরা পুরো দেশকে বুঝাই না। আমরা এই কাজটা অনেক সময় জেনে বুঝে করে থাকি আবার অনেক সময় না বুঝে অবচেতন ভাবে করে থাকি। আমরা 'পাকিস্তান' বলে আসলে নির্দিষ্ট কিছু এলাকাকে উদ্দেশ্য করে থাকি।

পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরের প্রতি ক্ষমতাসীনদের আচরণ কেমন ছিল দেখুন। বিভিন্ন গোত্রের সাধারণ নাগরিকদের টানা দশ বছর পর্যন্ত প্রত্যেক দিন নিজেদের লোকদের লাশ উঠাতে হয়েছে। বেলুচের সাধারণ মানুষদেরকে প্রতিনিয়ত বিকৃত চেহারার লাশ হাদিয়া দেয়া হয়েছে। সোয়াতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং বেলুচিস্তানে নিয়ম বহির্ভুত সামরিক শক্তি ব্যয় করা হয়েছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার মাঝে কোন পার্থক্য নেই এবং তার উপর প্রয়োজনের আওয়াজও অনেক দুর্বল ছিল।

চিন্তা করুন এসব কিছু যদি লাহোর, গুজরাট, পেন্ডি, পেশোয়ার, মরদান, করাচি অথবা হায়দারাবাদে হত তাহলে আমরা কী করতাম? দশ বছর পর্যন্ত যদি ড্রোন, জেট বিমান, ট্যাংক ও হেলিকপ্টার দিয়ে এসব এলাকায় বোমাবর্ষন করা হত তাহলে আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হত?

১৯৭১ সালে সরকারী ছত্রছায়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনকে উস্কে দেয়া হয়েছিল। এর পর পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী জনতার 'দেশপ্রেম' নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এখন আবার হচ্ছে। বর্তমানেও বিভিন্ন গোত্র এবং বেলুচিস্তানের আম জনতার উপর এই একই অপবাদ দেয়া হচ্ছে। তাদের 'দেশপ্রেম' নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন কাশ্মির প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন গোত্রীয় এই সাধারণ মানুষেরা নিজেরাই অগ্রগামী হয়ে কাশ্মিরের বড় একটি অংশ স্বাধীন করে নিয়েছিল। সেদিন থেকে তাদের প্রতি ভালবাসা, সে ভূমির সাথে সম্পর্ক এই ঘটনার পরও সেখানকার সাধারন মানুষদের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা তাদের উপর স্পষ্ট জুলুম।

বেলুচের আম জনতা যারা পাকিস্তানি আন্দোলনের সাথে ছিল, তারা এই ওয়াদা করেছিল যে - যখনি এ দেশের কোন ক্ষতির আশংকা দেখা দিবে, তৎক্ষণাৎ তারা তাদের ডাহাডরী বন্দুক নিয়ে প্রতিহত করার জন্য উপস্থিত হবে। এমন লোকদেরকে দেশের শত্রু বলা এবং তাদের উপর এই অপবাদ দেয়া যে, "তারা জাতীয়তাবাদ এবং ভাষা পূজার মন মানসিকতা পোষণ করে" -এটা সুস্পষ্ট বাড়াবাড়ি নয় কি?

বাস্তবতা হল- পাকিস্তান নিয়ে সকলের একটি স্বপ্ন ছিল যা এখন অচল হয়ে গেছে। সবাই এমন একটা পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিল যেখানে সকলেই হবে মুসলমান। চাই তারা এক জাতি হোক বা না হোক। সে যে জাতির মুসলিমই হোক- এখানে (পাকিস্তানে) তারা নিরাপদ থাকবে, স্বাধীন থাকবে। সকলকে একই দৃষ্টিতে দেখা হবে, এক পদ্ধতিতে সকলের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। এমন পাকিস্তান শুধু স্বপ্নতেই রয়ে গেছে বাস্তবে আর রুপান্তর হয় নি।

ক্ষমতাসীনরা কখনোই সবগুলো প্রদেশ মিলিয়ে অভিন্ন পাকিস্তানের কথা ভাবেনি। তারা নির্দিষ্ট কিছু প্রদশকে পাকিস্তান মনে করে। বাকিদের তারা পাকিস্তানি মনে করে না। আসুন একথাকে ভালবাবে বুঝার জন্য অতীত ও বর্তমানের কিছুটা তুলনা করে দেখি।

প্রথমে অতীতের দিকে সামান্য দৃষ্টি দেই। সরকারী মিডিয়া এবং স্কুলগুলোর সিলেবাস থেকে পাকিস্তান বিভক্ত হবার কি কারণ জানতে পারি?

ক্ষমতাসীনদের মতে- "কট্টর জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালীরা ভারতের ইশারায় চলতে গিয়ে দেশকে বিভক্ত করেছে"।

এ বিষয়ের দ্বিতীয় দিকের (আসলে সেটাই আসল দিক) ব্যাপারে কেউ কোন কথা বলেনা। সে বিষয়টা হল- বাঙ্গালী মুসলমানদের অন্তরে পাকিস্তানী রাষ্ট্রীয় আইন এবং সৈন্যদের প্রতি কেন এত ঘৃণা সৃষ্টি হলো?

অথচ পাকিস্তান বানানোর আন্দোলনে বাঙ্গালী মুসলমানদের অবদান অন্য চার প্রদেশের মুসলমানদের থেকে অনেক বেশি ছিল। ঐ সমস্থ বাঙ্গালীরাই ১৯৪০ এর ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের প্রস্তাব দিয়েছিল। এই বাঙ্গালীদের চাপাচাপিতেই এশিয়া উপমহাদেশে দুটি ভিন্ন ভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি রাষ্ট্র বানানো হয়েছিল, যার পূর্ব ও পশ্চিম নামে দুটি ভাগ ছিল। পরে এমন কি হয়েছিল যার জন্য বাঙ্গালীরা আমাদের সাথে দুই কদম সামনে চলাও মুশকিল হয়ে গেল?

এর উত্তর দিতে গেলে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক জুলুমের পর্দা উম্মোচন করতে হবে। এ জুলুম ছিল ব্যাপক আকারে, কিন্তু এখানে শুধু একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের উপর আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ।

বাস্তবতা হল- পাকিস্তান সরকার তথা সৈন্য, আমলা এবং রাজনৈতিক দলগুলো ইংরেজদের দালাল ছিল। ইংরেজরা ১৯৫৭ সালের আজাদী আন্দোলনে বাঙ্গালী জাতীর ঈমানী জযবা এবং বীরত্ব দেখেছিল। একারণেই তারা তাদেরকে দমিয়ে রাখার জন্য তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত। তাদেরকে

অপদস্ত করার মাধ্যমে দমিয়ে রাখতো।

ইংরেজদের পরে তাদের শাগরেদ ও অনুসরণকারীরাও ঐ মাজলুম জাতিকে ইংরেজদের মত করে দেখতো। পশ্চিম পাকিস্তানে একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, কালো রং এবং ছোট পা বিশিষ্ট বাঙ্গালীদের মস্তিস্ক রোগাক্রান্ত। তাদের বুদ্ধিশুদ্ধিও কম। তাই এদের না আছে যুদ্ধ করার যোগ্যতা আর না আছে কোন উচ্চ পদে নেতৃত্ব দেওয়ার।

এ অজ্ঞতাপূর্ণ নিচু দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল কি ছিল চলুন সেটা দেখে নেই। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহীনির ২৩ জন জেনারেলের একজনও দেশের সবচেয়ে বড় প্রদেশ বাঙ্গলার (পূর্ব পাকিস্তানের) ছিলনা। ৩৫ জন বিগ্রেডিয়ারের মধ্যে শুধু ১ জন বাঙ্গালী ছিল। ৫০ জন কর্নেলের মধ্যে বাঙ্গালী শুধু একজন, ৬০০ জন মেজরের মধ্যে বাঙ্গালী মাত্র ১০ জন, ৬০০ নেভি অফিসারের মধ্যে বাঙ্গালী ৭ জন, বিমানবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে মাত্র ৪০ জন।

সরকারি আমলাদের অবস্থা এর থেকে খুব বেশি ভিন্ন ছিলনা। ১৯ জন সেক্রেটারির মধ্যে একজনও বাঙ্গালী ছিলনা। ৪১ জন জয়েন্ট সেক্রেটারির মধ্যে বাঙ্গালী মাত্র ৩ জন, ১৩৩ জন ডেপুটি সেক্রেটারির মধ্যে ১০ জন, ১৫৮ জন আন্ডার সেক্রেটারির মধ্যে বাঙ্গালী ৩৮ জন ছিল। এখন আপনিই বলুন, কে কট্টর জাতীয়তাবাদী ছিল? বাঙ্গালী নাকি আমাদের পাকিস্তান সরকারী পদে বসে থাকা বদখতগুলো?

এটাতো গেল অতীতের জুলুমের কথা। আসুন বর্তমানের অবস্থাও দেখে নেই।

বর্তমানে বেলুচিস্তানের সাথে জুলুমের আচরন করা হচ্ছে। বেলুচি জাতির প্রতি ইংরেজদের পলিসি ছিল, তাদেরকে দমিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। ইংরেজরা বেলুচিদের মাথা তুলে দাড়ানোর সুযোগ দিতনা। কারণ ইংরেজরা তাদের যোদ্ধাসুলভ মনোভাব, ঈমানী শক্তি, বীরত্ব ও সাহসিকতা সম্পর্কে ভাল করেই জানতো। আফসোস! ইংরেজদের থেকে নামমাত্র স্বাধিনতা পাওয়ার পরও আমাদের সরকার সে মজলুম জাতির সাথে ফিরিঙ্গি চিন্তা-চেতনা নিয়ে আচরণ করছে।

তখন থেকে আজ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অফিসার পর্যায়ে (পাকিস্তানের সকল খাতের হিসাবে) সবচেয়ে বড় প্রদেশ বেলুচিস্তানের শতকরা একজন অফিসার হয়েছে। সৈন্য হিসাবে এর পরিমাণ শতকরা একজনেরও কম! এমনিভাবে আজাদ কাশ্মিরের অধিবাসীদের থেকে অফিসার পর্যায়ে রয়েছে শতকরা ২ জন, সিন্ধুর শতকরা একজন, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের শতকরা একজনেরও কম। দেশের সৈন্যদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন পাঞ্জাবের, প্রায় ১২ জন করাচি এবং হায়দারাবাদের, ৮ জন সীমান্তের এবং ৫ জন ইসলামাবাদ শহরের।

আমলাতন্ত্রের কার্যক্রম এর চিত্রও এমনি। সেসময় আমলাতন্ত্রের অফিসারদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন পাঞ্জাবের, আর বাকি ৫০ জন অন্য সকল এলাকার।

প্রশ্ন হল - কোন নিয়মের ভিত্তিতে বা কোন রুল অনুযায়ী পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং সরকারী চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হয়? আমি নিজে পাঞ্জাবের অধিবাসী হওয়ার পরও এটা বুঝতে পারিনা সেনাবাহিনীতে বেলুচ, পশতু এবং কোহেস্তানের মত যোদ্ধা জাতীর সৈন্য পরিমাণ কেন এত কম দেখা যায়? যদি এটা কোন গোপন বিষয় না হয় এবং এর যদি কোন যুক্তিসম্মত উত্তর থাকে, তাহলে সেনাবাহিনী এবং সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পদ্ধতির পর্দাকে কেন উম্মোচন করা হচ্ছেনা?

এটা প্রদেশ সমূহের পরস্পরের ঝগড়ার বিষয় নয়। অন্যায় পাঞ্জাব বা করাচির সাধারণ মানুষেরও নয়। বরং বাস্তবতা হল- তাদের উপর ফিরিঙ্গিদের মানসসন্তান চেপে বসে আছে। অহংকারমূলক চিন্তাধারা ও কট্টর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একদল হায়েনা তাদের উপর কর্তৃত্ব করছে।

জেনারেল, রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং সরকারী চাকরীজিবীরা পূর্বে থেকেই নিজেদের কট্টর পক্ষপাতিত্বের দ্বারা এদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। যদি ঐ সমস্ত মূর্খ লোকদের হাত থেকে দ্রুত ক্ষমতা না নেয়া হয় তাহলে সামনেও তারা এভাবেই এদেশকে চালাবে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আল্লাহ না করুন যদি এবার কোন ভাঙ্গন শুরু হয়ে যায়, তাহলে দুই ভাগ নয় বরং দশ-বার ভাগ হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এসমস্থ লোভী, দ্বীনের শত্রু, কট্টর ও গাদ্দারের দল থেকে নাজাত দান করুন।

আমীন – ইয়া রাব্বাল আ'লামিন।

অনুবাদ: মাওলানা মাহমুদ

জিহাদের ফলগুলো একত্রিত করা হল!

[আর-রিসালাহ (সংখ্যা: জুলাই ২০১৫ ঈসায়ী) ম্যাগাজিনকে দেওয়া
আমির আবু ওয়ালীদ মুসলিম আশ-শিশানী এর একান্ত সাক্ষাৎকার]
সংক্ষিপ্তকরণ: নভেম্বর ০৫/২০১৮ ঈসায়ী

আব্দুল্লাহ বখতিয়ার অনূদিত

الفردوس
AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

আমির আবু ওয়ালীদ মুসলিম আশ-শিশানী হাফিজাহুল্লাহ এর পরিচয়

আবু ওয়ালীদ মুসলিম আশ-শিশানী হলেন শামের ভূমিতে জুনুদুশ শাম গ্রুপের আমির। তাঁর গ্রুপের মুজাহিদ সদস্যদের অধিকাংশই 'মা-ওয়ারাউন্ নাহার' তথা উজবেকিস্তান ও মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখতো। তিনি এবং তার সঙ্গী মুজাহিদগণের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি ছিল যে, তারা নুসাইরী কাফেরদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধের সময় চূড়ান্ত পর্যায়ের বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতেন। দৃষ্টান্তমূলক এই বীরত্বের কারণে তিনি শুধু গোটা দুনিয়ার কাফেরদের চোখের কাঁটাই হননি বরং শত্রুদের অঙ্গনে তিনি ত্রাসেরও কারণ ছিলেন।

তিনি মৌলিকভাবে জর্জিয়ার এয়ার ডিফেন্স ফোর্সের প্রধান ছিলেন। আফগান যুদ্ধের প্রথম ফলাফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর তিনি চেচনিয়ায় ফিরে আসেন।

১৯৯৫ সালে তিনি চেচনিয়া এবং তার আশপাশের রুশ সৈন্য ও তাদের এজেন্টদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আরব মুহাজির মুজাহিদদের মহান নেতা খাত্তাব (রহঃ) এর দলে অংশগ্রহন করেন। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মদদ ও সাহায্যে তখন থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত তিনি জিহাদের পথে আছেন।(আল্লাহ তা'আলা তাকে দৃঢ়তা দান করুন। আমীন।)

তিনি কমান্ডার খাত্তাব এবং তার অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু ওয়ালদি ও উস্তাদ আবু জাফরসহ কয়েকজন বড় নামি দামি আরব মুজাহিদ নেতাদের সাথে কাজ করেছেন। চেচনিয়ায় তিনি ওয়াদিয়ানু এলাকার আমির ছিলেন। আমিরে মুসলিম উস্তাদ আবু ওয়ালদি (রহঃ) ২০০২ সালে তাকে বত্রিশ জন মুজাহিদের কমান্ডার বানিয়ে কামানসহ সানজা জেলায় প্রেরণ করেন, রুশদের বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধ ফ্রন্ট খোলার জন্য।

২০০৩ সালে তিনি রুশ বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে জালিমের বন্দীখানায় কঠোর নির্যাতনের সম্মুখীন হন। আড়াই বছর কারাভোগের পর তিনি কঠিন অসুস্থ অবস্থায় মুক্তি পান। চিকিৎসার উদ্দেশে তিনি দ্বিতীয়বারের মত জর্জিয়ায় চলে যান। চিকিৎসার সুবাদে সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। সুস্থ হওয়া মাত্রই আল্লাহর এই সিংহ পুনরায় জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

২০০৮ সালে তিনি এক জিহাদি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এই সংগঠনের সদস্যদের মাধ্যমে রুশ এজেন্টদের নাকানি চুবানি খাইয়েছেন।

আরব বসন্ত বা সিরিয়া যুদ্ধের সূচনাতেই তিনি স্বীয় গ্রুপসহ ২০১২ সালে সিরিয়াতে আগমন করেন এবং নুসাইরি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মজলুম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষে জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু করেন। তিনি মুহসিনে উম্মত শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) এর আদর্শের একজন কর্মী ও দায়ী ছিলেন। শামের ভূমিতে নববী আদর্শের ধারক বাহক সকল আনসার ও মুহাজির গ্রুপের সাথে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তার এই সাক্ষাৎকার ২০১৫ সালে নেওয়া হয়েছিল। সে সময় যুগের খারেজী সম্প্রদায় দায়েশ তথা আই এস এর ফেতনা নিজস্ব গতিতে চলছিল। তিনি তার এই আলোচনায় খারেজীদের দৃষ্টিভঙ্গিকে কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার কারণগুলোও স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

তিনি আই এস এর ফেতনার শুরু থেকেই কঠোর বিরোধিতা করেছেন। সেই সাথে তিনি নিজ সাথীদের শাহাদাতের হক্ব প্রক্রিয়া ও তার মর্যাদার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

এই ফেতনা চলাকালীন সময়ে আমিরে মুসলিম আবু ওয়ালীদের কয়েকজন সাথী আই এস খারেজীদের হাতে শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হেফাজত করুন এবং নববী ধারায় খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দৃঢ়পদ রাখুন।

এই সাক্ষাৎকার শামের ভূমিতে শহিদ হয়ে যাওয়া হিন্দুস্তানি মুজাহিদ আবু বাসীর আল হিন্দি তাকাব্বাল্লাহু এর হাদিয়া ছিল। যিনি শামের মুজাহিদদের প্রসিদ্ধ পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

আমিরে মুসলিম আশ্ শিশানী হাফিজাহুল্লাহ হলেন আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যুদ্ধের ব্যাপারে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ একজন চেচেন মুজাহিদ।

কয়েক বছর ধারাবাহিকভাবে জিহাদ করা সত্ত্বেও তিনি এখনও লাগাতার নিজের জিন্দেগী তরবারির ছায়াতলে অতিবাহিত করছেন। তিনি উত্তর সিরিয়ার ফুলুকত এলাকায় ছিলেন এবং জালেম বাশার (আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুক) এর বাহিনীর সাথে তুমুল বেগে যুদ্ধ করেছেন। আমিরে মুসলিম এবং তাঁর সহযোগী মুজাহিদগণ ঈমানদারদের জন্য শুধু

تحريض علي الجهاد

এর বড় কারণ বা ভূমিকাই ছিলেন না , বরং তাঁদের রু'ব বা আতঙ্ক কাফের বাহিনীকে সর্বদা প্রকম্পিত রাখতো। আর তিনি আপন রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সবসময় এই সফর জারী রাখতেন।

শামের মুজাহিদগণ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিদিনই চূড়ান্ত পর্যায়ের কষ্ট ক্লেশ ভোগ করছেন এবং অসংখ্য কুরবানী পেশ করছেন। আমাদেরও উচিৎ যে, তাদের জন্য লাগাতার দোয়া করতে থাকা, আল্লাহ তা'আলা যেন তাদেরকে শত্রুর সামনে দৃঢ় পদ রাখেন এবং তাদের শ্রমকে কবুল করেন।

কমান্ডার খাত্তাব (রহঃ) এবং চেচনিয়া

আর-রিসালাহ : আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আমিরে মুসলিম : ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আর-রিসালাহ : আমরা আমাদের কথা-বার্তা খাত্তাব (রহ.) এর আলোচনা দিয়ে শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ এখানকার সকল ভাই তাকে সীমাহীন ভালোবাসেন। তিনি কত বড় মহান ব্যক্তি ছিলেন এই নিয়ে তারা আলোচনা পর্যালোচনা করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর চেষ্টা সাধনাকে কবুল করুন।

আমিরে মুসলিম : আমীন ।

আর-রিসালাহ : আমরা এই বিষয়টি জানি যে, আপনি শহীদ কমান্ডার খাত্তাব রহ. এর সাথে বহু সময় অতিবাহিত করেছেন। চেচনিয়ায় খাত্তাব (রহ.) এর সাথে কাটানো সময়গুলোর ব্যাপারে যদি আমাদের কিছু বলতেন...

আমিরে মুসলিম : খাত্তাব রহ. ও তাঁর সাথের অন্য ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শুধু আমার মাঝেই নয় বরং অন্য আরো কয়েকজন যুবকের জীবনেও এক অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এটা ঐ সময়ের বিষয় ছিল যখন চেচনিয়া ও অন্যান্য স্থানে ইলমের খুবই সংকট ছিল এবং জিহাদের মাত্র সূচনা পর্ব ছিল। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা দেখলাম যে পরিবর্তন খুব দ্রুত হতে লাগল। আমাদের মধ্য থেকে অনেকেই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে কাফেরদের বিরুদ্ধে ইলমে জিহাদকে সমুন্নত করার সুযোগ পেয়েছেন। আমরা সমকালীন বুযুর্গদের থেকে শাহাদাতের ফযীলত সম্পর্কে শুনতাম। আমরা আল্লাহর রাস্তায় টুকরা টুকরা হয়ে মৃত্যু বরণ করার জন্য এমনভাবে প্রস্তুত থাকতাম যেন, শুধু শাহাদাতের কথা স্বীকার করেই কোনরুপ হিসাব নিকাশ ব্যতিত আমরা আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করে ফেলব। আমাদের ভয়ংকর যুদ্ধগুলোতে কোনরুপ ভয়-ভীতি ছাড়া অংশ গ্রহনের এটাই ছিল মূল কারণ।

শায়খ ফাতহা, খাত্তাব, আলেম আবু উমর সাইয়্যাফ, আবু ওয়ালিদ এবং আবু জাফরের মত ব্যক্তিবর্গের কারণেই চেচনিয়ার এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। লোকেরা ইসলাম নিয়ে অধ্যায়ন শুরু করে দিয়েছে ও তা বুঝে নিয়েছে। ধীরে ধীরে সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।

আলহামদুলিল্লাহ আমি নিজে ইসলামের উত্তম বুঝ অর্জন করেছি তরবিয়তী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, যা স্বয়ং খাত্তাব (রহ.) করিয়েছিলেন। তিনি এবং অন্যান্য আরব ভাইগণ আমাদের সামনে ইসলামের বাস্তবতাকে উত্তম ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু নিজেদের শব্দ ও বাক্যের দ্বারাই নয় বরং নিজেদের কাজ কর্মের দ্বারাও। আর নমুনা স্বরুপ তাদের উপস্থিতির কারণে নামি-দামি যুবক ও বুযুর্গদের বড় একটি সংখ্যা জিহাদের কাজে সহযোগিতা করা শুরু করে।

ঐ সময় আমরা জিহাদের পথে সৃষ্ট ফেতনা ও মসিবত সমূহের সামান্যতম আশংকাও করতাম না। কেননা বাস্তবিক ভাবে আমরা এ কথার সাক্ষ্য ছিলাম যে, কিভাবে ইসলামেরই মাধ্যমে জ্ঞানীদের দ্বারা প্রত্যেক জটিল বিষয়ের সমাধান করা যায়। আমাদের এই লোকদের (আরব মুজাহিদদের) উপর তাদের ইখলাসের কারণে এই আস্থা ছিল যে, তারা নিজেদেরকে এবং আমাদেরকেও গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাবেন না।

আমি আমার জিন্দেগীর এই অংশকে উত্তম অংশ হিসেবে মনে করি। এর আগে আমি ঈমানের উপর এত মজবুত ছিলাম না। যখন এই ভাই শহীদ হন তখন মনে হয়েছিল যেন আমাদের পায়ের নীচ থেকে জমিন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে এই দুনিয়ার হাজারো মসিবতের মোকাবেলা করার জন্য একা ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

এই আরব মুজাহিদগণের আমাদের থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াটা আমাদের জন্য এই পরিমাণ বেদনাদায়ক ছিল যে, আমি অধিকাংশ সময় চিন্তা করতাম সাহাবায়ে কেরাম থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াটা কি পরিমাণ বেদনাদায়ক ছিল।

আর-রিসালাহ : আচ্ছা। এবার আপনি আমাদের খাত্তাব রহ. ব্যক্তি হিসেবে কেমন ছিলেন সে বিষয়ে যদি কিছু বলতেন?

আমিরে মুসলিম : খাত্তাব রহঃ একজন সাদাসিদে ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খোশ গল্প করতেন, অনেক হাঁসতেন, লোকদের সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের উত্তম ও মজবুত সম্পর্ক স্থাপন করতেন। তাকে আপন উপস্থিতি ও কর্মচাঞ্চল্যের কারণে লোকদের মাঝে সীমাহীন ইজ্জতের দৃষ্টিতে দেখা হত। তিনি নামি দামি লোকদের চাল-চলন ও রীতি-নীতি শিখেছেন। আর এ কথা আমি অবশ্যই বলতে চাচ্ছি যে, এই বিষয়ে আমাদের লোকদের আচরণ খুবই কঠোর হয়ে থাকে। যদি খাত্তাব রহ. এই সব বিষয় না শিখতেন তাহলে তিনি ঐ সকল লোকদের মন জয় করতে পারতেন না। এমন কি তিনি মর্যাদার পোষাককেও নিজের মত করে তৈরি করে নিয়েছেন।

চেচনিয়ায় সাধারণত কারো ব্যক্তিত্বকে লোকেরা তাঁর পোষাক দিয়ে অনুমান করতো। আমাদের চাল-চলন এমন ছিল যা বুযুর্গ ও নওজোয়ানদের উপড় খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

নানান বাঁধা সত্বেও খাত্তাব রহ. তাদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন। এটা কোন অবস্থাতেই সহজ ছিল না। কারণ একদিকে তিনি জিহাদের কাজ করতেন এবং সুন্নতের উপর কঠোরতার সাথে আমল করতেন, অন্যদিকে তার

বিরুদ্ধচারনকারীরা তাকে "ওয়াহাবী" বলা শুরু করে। একারণে পরিস্থিতি খুব ঘোলাটে হয়ে যায়। অনেক সময় লোকেরা আমাদের চিন্তা চেতনাকে নিজ মতাদর্শ থেকে অপরিচিত মনে করতো। তা সত্ত্বেও সাধারণ লোকেরা নিজেদের মাসআ'লাসমুহ হল করার জন্য খাত্তাব (রহ.) এর কাছেই আসতো। আর তিনিও তাদের জটিল বিষয়গুলোর সমাধান করে দিতেন। এ কারণেই তিনি মর্যাদাবান লোকদের থেকে এমনকি পীর-মাশায়েখসহ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্মান ও ভালবাসা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

আর-রিসালাহ : তিনি কি একজন উত্তম মুরব্বী এবং উস্তাদ ছিলেন?

আমিরে মুসলিম : তিনি লোকদেরকে খুব ভালো করে চিনে রাখতেন এবং খুব উত্তম পন্থায় তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। দ্বিতীয় বারের মত তার কাছে তিন মাসের জিহাদী প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় তিনি আমার দিকে বিশেষ কোন মনযোগ দেননি। কিন্তু যখন ঐ প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে তখন তাঁর সাথে আমার এক গাড়ীতে সফরের সুযোগ হয়েছে যা এখনো স্মরণে আছে।

তিনি আমাকে গাড়ীতে তাঁর সাথে বসতে বলেছিলেন। তাঁর সাথে কথা বলার পর আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, তিনি আমার সম্পর্কে সব কিছু জানেন। ড্রাইভিং চলাকালীন সময়ে তিনি আমাকে আমার অতীত জীবন সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন। আমি কোথায় থাকি, কোথায় কি করি ইত্যাদি আরো অনেক কিছু তিনি জানতেন।

অতঃপর হঠাৎ তিনি গাড়ি থামিয়ে বাইরে বের হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফোন করলেন। ফেরার পথে আমাকে কিছু বিষয়ে নসিহত করলেন। আমাকে আমাদের মারকাযের লক্ষ্যসমূহ কী এবং কীসের জন্য আমরা এত চেষ্টা সাধনা করছি তা অল্প ভাষায় বুঝিয়ে বললেন। সেই দিনের প্রত্যেকটি বিষয় আমার ভালোভাবে স্মরণ আছে। তিনি আমাকে এই জিহাদী কাজের ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করেছিলেন। আমার এই কথাগুলো এত স্পষ্টভাবে মনে আছে যে আমি প্রত্যেকটি শব্দ সহ বলতে পারব। আমি এখন মাঝে মাঝে ভাবি যে, হয়ত সে দিন তিনি এই উদ্দেশ্যেই আমাকে তাঁর সাথে নিয়েছিলেন।

অতঃপর তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, তুর্কিস্তান থেকে আগত মাল-সামানা ও সদস্যদেরকে জর্জিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত পার করানোর কাজে আমার সাহায্য করা উচিৎ। আমার গৌরবের বিষয় হল, তিনি আমাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছিলেন আর আমিও খুব আনন্দের সাথে এই খেদমত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম।

মারকাযে বা কেন্দ্রে ফিরে এসে গাড়ী থেকে নামার পর তিনি আমার দিকে মুচকি হাসির ভাব নিয়ে তাকালেন। তাঁর চেহারা ছিল উজ্জ্বল লাল বর্ণের। আমার কাছে মনে হল এই মুচকি হাসিতে কোন গোপন রহস্য লুকায়িত ছিল। সেসময় আমার চেহারাও আনন্দে লালচে বর্ণের হয়ে গিয়েছিল। কারণ এই প্রথম আমি নিজেকে বাস্তবেই একজন মুজাহিদ হিসেবে অনুভব করছিলাম।

আর-রিসালাহ : তাঁর জীবনী থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়টি আপনি শিখেছেন ?

আমিরে মুসলিম : উলুমে ইসলামিয়া ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি তা হলো- লোকদের সাথে কিরুপ আচরণ করতে হবে। বর্তমানে আমাদের যুবকদের মাঝে এই বৈশিষ্টের খুবই অভাব পরিলক্ষিত হয়। জিহাদের সূচনালগ্নে লোকেরা মনে করতো যে, মুজাহিদগণ হলেন এই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আর বাস্তবতাও এমনই, কেননা একজন ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে সে এটা ছাড়া আর কি-ই-বা ভাল কিছু করতে পারে? লোকেরা সাহাবায়ে কেরামের ঘটনা পড়ে মুজাহিদদেরকে তেমনি ধারনা করতো এবং মুজাহিদদের থেকে সাহাবা ওয়ালা আদর্শেরই আশা করতো। কিন্তু কিছু যুবক নিজ অজ্ঞতার কারণে সর্ব সাধারণের সাথে ধৈর্য ধারনের চেহারা প্রদর্শন করতে পারেনা। আর এভাবেই আমরা এমন সব গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হারিয়ে ফেলি যা আমরা নিজেদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে অর্জন করেছিলাম।

মুজাহিদ হলো মাছের মত আর সাধারণ মুসলমানরা হলো তার সমুদ্র। এই সমুদ্রে মুজাহিদরা সহজেই সাতাঁর কেটে বিচরন করে বেড়ায়। লোকেরা যত বেশী মুজাহিদদেরকে মুহাব্বত করবে, মুজাহিদদের নিকট তত বেশী সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ধৈর্যহীন কিছু লোক যারা নিজেদেরকে মুজাহিদ বলে মনে করে তারা উদ্ভট ধরনের আচরণ করে বেড়ায়। যেহেতু তাদের এখন কিছু শক্তি আছে, তাই তারা এমন আচরণ করতে থাকে, মনে হয় যেন সেই এই দুনিয়ার প্রকৃত মালিক আর অন্য সকলে তার গোলাম। সে দুর্বল মুসলমানদেরকে অপমান করতে শুরু করে এবং কটাক্ষ করে। আরো এমন কিছু কাজ করে যা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সময়ে কাফের মুশরিকদের সাথেও করেননি। অতঃপর কাফেররা এসকল কাজকে আমাদের বিপক্ষে সর্ব সাধারণের রায় বলে প্রচার করে বেড়ায়।

দুর্ভাগ্য আমাদের এসকল আচরণ ঐসকল লোকদেরকেও আমাদের বিপক্ষে দাড় করিয়ে দিয়েছে যারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিল। আর এটা অনেক বড় ও জটিল একটা সমস্যা। আমার মতে উলামায়ে কেরামের এদিকে মনোনিবেশ করা উচিৎ। যাতে ঐসকল যুবকদেরকে তারা বিশুদ্ধ ইসলামী আদব কায়দা ও শিষ্টাচার শিখিয়ে দিতে পারেন। লোকদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে এবং কিভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে উত্তম ব্যবহার করতে হবে সেটা এই সকল যুবকদের শিখানোর

ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত।
আর-রিসালাহ: আপনি কমান্ডার খাত্তাব রহ. এর সাথে কয়টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন?

আমিরে মুসলিম : আমি কয়েকবার তাঁর সাথে কয়েকটি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরিক ছিলাম। সাধারণত আমি সম্মানিত ভাই আবু জাফরের কমান্ডে থাকতাম, তারপর ভাই আবু ওয়ালীদের কমান্ডে। তো আমি এ সম্পর্কে আপনাকে একটি ঘটনা শোনাতে চাই।

২০০১ সালের কথা। তখন খাত্তাব (রহ.) এবং শামেল বাসায়ুফ (রহ.) শা'লী এলাকায় শত্রুদের থেকে কিছু এলাকা ছিনিয়ে নেয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আল্লাহর অনুগ্রহে কিছু এলাকা অর্জনও করেছিলেন। এই যুদ্ধে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে আমরা মাত্র ১৬ জন শত্রুদের একটি পূর্ণাঙ্গ কাফেলাকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

আমরা শা'লীর উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করি। শা'লী আমাদের অবস্থান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। আমরা রাতের অন্ধকারে প্রায় সাত আট কিলোমিটার সফর করে গিয়েছিলাম।

সড়কের পাশে অবস্থিত একটি সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসা গোলা বারুদের বিকট আওয়াজ থেকে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ভারী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত কাফের বাহিনী তখন সুযোগ বুঝে নিজেদের শক্তিমত্তার প্রদর্শনী শুরু করে দিল। সেই সাথে শত্রু বাহিনী তাৎক্ষনিকভাবে নিজেদের অতিরিক্ত সাহায্যকারী দল খুঁজতে লাগলো। আমরাও তাৎক্ষনিকভাবে নিজেদের সহযোগিতার জন্য মুজাহিদদেরকে তালাশ করতে থাকি। আমরা প্রত্যেক সম্ভাব্য স্থানে পৌঁছে যাওয়া ভাইদেরকে আহবান করি আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য। এই ভাইয়েরা পাশের গ্রামে ও আমাদের সম্মুখের পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন।

শা'লী যুদ্ধের প্রস্তুতির সময়কার একটি ঘটনা -

তখন আমি ভাই আবু ওয়ালিদের কমান্ডে ছিলাম আর তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের জন্য আমাকে তলব করেছিলেন। আমি যখন তাঁর কাছে পৌঁছি তখন সেখানে ভাই শামেল, খাত্তাব, আবু ওয়ালদিসহ অন্যান্য আমীরগণও উপস্থিত ছিলেন। খাত্তাব রহ. একটি নকশা খুলে দিলেন এবং শহরের নিদর্শন যুক্ত স্থান যেখানে শত্রু বিদ্যমান আছে তাদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য আমাদেরকে জানালেন। আমাদের কাজ ছিল চল্লিশ জন ভাইয়ের একটা দলের জন্য রাস্তা ক্লিয়ার রাখা যারা আগে গিয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করবে। আমাদের মধ্য থেকে দশ জন ভাইকে শত্রুদের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে পাশের শহরে যাওয়ার পূর্বে আমি সেখানকার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নেই। আমার কাছে চেকপোস্ট অতিক্রম করার জন্য একটি বানানো পাসপোর্টও ছিল। আমি ঐ শহরে পৌঁছে ঐ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করেছিলাম। অতপর কিছু পানাহারের জন্য একটি হোটেলে যাই। হঠাৎ সেখানে যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু হয়ে গেল। আমাদেরকে সহ সকলকে গ্রেফতার করে তাদের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে গেলো। অবশ্য কয়েক ঘন্টা পর আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ।

এরপর আমি আমার মিশন পুরো করে কেন্দ্রে ফিরে আসি। আমি খুব করে চাইছিলাম এই ঘটনাটি আমার আমির আবু ওয়ালিদের গোচরে না আসুক। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে আমি তার অসন্তুষ্টির মুখে পড়ি কিনা। কিন্তু আমার সাথী নিজেকে বিরত রাখতে পারল না এবং বিষয়টি তাঁর পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

আবু ওয়ালদি তার তাঁবুতে খাত্তাব রহঃ এর সাথে ছিলেন। যখন তিনি এই ঘটনা জানতে পেরেছেন তখন তিনি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে উঁচু আওয়াজে বলতে লাগলেন, "তোমরা কি জানো কে উত্তম গেরিলা যোদ্ধা? তিনি হলেন এই সাহসী ব্যক্তি" এই বলে তিনি আমার দিকে ইশারা করলেন। এরপর তিনি সকলকে এই ঘটনা শোনানো শুরু করলেন যে, "আমরা আমাদের কিছু ভাইকে শা'লী শহরে কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এই সাহসী ভাই সোজা বরাবর ঐ শহরে ঢুকে যায়"। আমার ব্যপারে আবু ওয়ালদির উক্ত বক্তব্য শুনে খাত্তাব রহঃ মুচকি হাসলেন।

পরবর্তিতে খাত্তাব রহ. যখন আমাকে কোন মিশনে পাঠাইতে চাইতেন তখন আবু ওয়ালিদ বারণ করতেন। আমার এই অসতর্কতার কারণে এটা ছিল আমার জন্য শাস্তি স্বরুপ। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ শা'লীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ পূর্ণাঙ্গরুপে সফল হয়েছিল। এই যুদ্ধে আমাদের একজন ভাই শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

আর-রিসালাহ : যখন খাত্তাব রহঃ শহীদ হয়ে গেছেন তখন মুজাহিদগণ জিহাদের পথে সফর কিভাবে অব্যহত রেখেছেন?

আমিরে মুসলিম : দুর্ভাগ্যবশত খাত্তাব রহঃ এর শাহাদাত আমাদের সকলের জন্য ছিল চুড়ান্ত পর্যায়ের আতঙ্ক ও পেরেশানির কারণ। শাহাদাতের পূর্বে খাত্তাব রহ. একটি সাংগঠনিক নীতিমালা দাড় করিয়ে ছিলেন যার তত্ত্বাবধানে আমরা চলেছি। তাঁর শাহাদাতের পর ভাই আবু ওয়ালিদ আমির হয়েছেন। আমরা তাঁর নিকট আনুগত্য প্রকাশ করি এবং নিজেদের বিষয়াদি তাঁর কাছে পেশ করি। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে কিছু ভাই এখনো পর্যন্ত ইসলামকে দৃঢ়তার সাথে আকড়ে ধরে জীবিত ও অক্ষত আছেন। এবং এই সফরের শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার উপর থাকবেন ইনশা আল্লাহ।

হিজরতে শাম

আর-রিসালাহ : মা'শাআল্লাহ। শায়েখ এখন আমরা পুনরায় শামের দিকে মনোনিবেশ করছি। আমরা এটা জানি যে, আপনি কিছুদিন যাবত এখানে নিরবতার সাথে রয়েছেন। আপনার কাছে শামের জিহাদ ও চেচনিয়ার জিহাদের তুলনাটা কেমন? (এখানে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, এই সাক্ষাৎকার ২০১৫ সালের ফেতনার সময়ে নেওয়া হয়েছিল)।

আমিরে মুসলিম : চেচনিয়ায় শারীরিক কষ্ট অনেক বেশি ছিল কিন্তু সেখানে আমরা এই "আই এস" খারেজীদের মতো কোন ফেতনার সম্মুখীন হইনি। সেখানে আমরা এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এই ফেতনাটা বড় ধরণের একটা মানসিক কষ্ট। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ ঘোষণাও আমার স্মরণে আছে যার সারমর্ম হলো - ফেতনা এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যে, এক ব্যক্তি সকালে মুসলমান হবে তো সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও ঘোষণা করেছেন যে, কিছু জ্ঞানী বুদ্ধিমান যুবক ফেতনা বৃদ্ধিকারী হবে।

এই অল্প বয়স্ক যুবারা আল্লাহ তা'আলার ফয়সালাকৃত সাধারণ নীতিমালার অনুসরণ করে না। তাছাড়া এই "আই এস, খারেজী, মুরজিয়া" ফেতনাবাজ লোকেরা ইসলামের বিধানাবলীর ব্যাপারে উলামাদের কাছ থেকেও ইলম অর্জন করেনা।

চেচনিয়ায় আমরা আমাদের বুযুর্গ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতাম, যারা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি জ্ঞানী ছিলেন। 'বুযুর্গানে দ্বীনসহ জিহাদী নেতৃত্ব' চলে যাওয়ার পর আমাদের জন্য অবস্থা দিন দিন প্রতিকূল হয়ে উঠছিল। সে সময় শামিল বাসায়ুফ এবং খাত্তাব রহঃ এর মত ব্যক্তিরা টেলিভিশনে প্রায়ই বক্তব্য দিতেন। তারা লোকদেরকে বিভিন্ন ফেতনা সম্পর্কে সতর্ক করতেন। তারা লোকদের কাছে জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করতেন।

কিন্তু এখন এই অনভিজ্ঞ বাচ্চাদেরকে মিডিয়াতে মুজাহিদদের মুখপাত্র হিসেবে অংশগ্রহন করতে দেখা যায়। তাদের ইলমি অজ্ঞতা তাদের কথা শুনলেই বুঝা যায়। এমনকি তাদের অবস্থা এখন এমন যে, যেসকল মুজাহিদ তাদের সমস্ত জিন্দেগী জিহাদের পথে কাটিয়ে দিয়েছেন এই যুবকেরা তাদের কথা পর্যন্ত শুনতে ইচ্ছুক না।

চেচনিয়ায় আমাদের রেওয়ায়েত ছাড়া বড়দের সাথে ব্যতিক্রমী কোন আলোচনার অনুমতিই ছিলনা। এই নতুন ফেতনা 'খারেজী ও মুরজিয়া'র বংশধররা দ্বীনের ইলম না থাকার কারণে এমন অনেক কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে যা মুজাহিদদের পূর্ববর্তী বংশধরগণ অনেকদিনের চেষ্টাই অর্জন করেছিলেন। আর এটাই ছিল সবচেয়ে বেশি বেদনাদায়ক বিষয়।

আর-রিসালাহ : সিরিয়ায় বাশারের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা বেশি দুস্কর নাকি রুশ বাহিনীর সাথে?

আমিরে মুসলিম : নিঃসন্দেহে বাশার বাহিনীর তুলনায় রুশদের সাথে যুদ্ধ করা কষ্টের। কিন্তু যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি তাহলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে আমরা ইন'শা আল্লাহ বাশার ও রুশ উভয় বাহিনীর সাথে সহজেই বিজয় অর্জন করতে পারবো। আহলে সুন্নাহ এর মাঝে বিদ্যমান গণতন্ত্রপন্থী ও তাগুতের সাহায্যকারী বিভিন্ন দলের মতবিরোধই আমাদেরকে বিজয় অর্জন থেকে দুরে সরিয়ে রেখেছে।

আর-রিসালাহ : আপনার নিকট শামের জিহাদে সবচেয়ে বেশি পেরেশানী সৃষ্টিকারী বিষয় কোনটি?

আমিরে মুসলিম : মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ফেতনা।

আর-রিসালাহ : আপনি ঐ সকল লোকদেরকে কি পরামর্শ দিবেন যারা জিহাদের উদ্দেশ্যে শামে আসতে চায় ?

আমিরে মুসলিম : শামে আসতে আগ্রহী লোকদেরকে আমি এই পরামর্শ দিব যে, আপনারা কোরআন সুন্নাহর অনুসরণ করবেন। শুধু শাব্দিক ভাবে নয় বরং আ'মালের মাধ্যমেও। জিহাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ এমন বুযুর্গ মুজাহিদগণ কি বলেন তা খুব ভালোভাবে শুনবেন ও তা থেকে ফায়দা গ্রহন করবেন। এটা কোরআনের মাঝে বলা হয়েছে যে,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

হে লোক সকল! তোমরা আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের ইলম না থাকে। (সূরা আম্বিয়া: ৭)

এমনিভাবে এক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলেমগণকে নবীগণের ওয়ারিশ ঘোষণা করেছেন।

এমনিভাবে আরেক হাদীস অনুযায়ী বলা হয় যে, শেষ জমানায় শামে একটি দল হবে। একইভাবে ইয়ামেনে এবং ইরাকেও। তখন মুজাহিদগণ হয় শামের বাহিনীতে যোগ দিবে অন্যথায় ইয়েমেনের বাহিনীতে যোগ দিবে। (সূত্র: আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

কিন্তু আমরা দেখছি লোকেরা ইরাকের (আই এস) এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আলহামদুলিল্লাহ ইরাক ও শাম সম্পর্কিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যদি আপনি প্রকৃত পক্ষে হক্বপন্থি উলামাদের অনুসরণ করতে থাকেন তবে এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ সন্দেহ মুক্ত হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

ভাইয়েরা!

এমনটি করা থেকে বিরত থাকা চাই যে - আপনি ঐ সকল আই এস নামক খারেজী ও মুরজিয়া লোকদের অনুসরণ করবেন, (এরা ইলমী বিষয়ে ভাসা ভাসা জেনেই নিজেদেরকে আলেম মনে করে) এরপর নিজেদের অজ্ঞতা ও সংশয়ের উপর ভিত্তি করে লোকদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করলেন।

আজ আমি স্পষ্ট দুটি তাঁবুর উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি।

এক দিকের তাবুতে আছেন সে সকল মুজাহিদীনরা যাদের কাছে ইলম আছে, অভিজ্ঞতা আছে, সে সাথে ঈমানও আছে। অপর দিকের তাবুতে রয়েছে কিছু অনভিজ্ঞ বাচ্চা ছেলে। যাদের অধিকাংশই ইন্টারনেটের এমন কিছু ভিডিও দেখে প্রভাবিত হয়েছে যেগুলোতে মুজাহিদীন ও তাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয়েছে। তারা এ ধরণের প্রোপাগান্ডা ছড়ানো দা'য়ীদেরই অনুসরণ করে।

আমাদের চেচনিয়ায় একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, 'পাত্র থেকে তাই বের হয় যা তার ভিতরে আছে'। আমি কোহেকাফের মুজাহিদদেরকেও এটাই বলতে চাচ্ছি যে, তোমাদের কি হলো? বুযুর্গদেরকে অপমান করা এবং তাদের পরামর্শকে প্রত্যাখান করা তো আমাদের আদর্শ নয়। আমরা সবসময় বুযুর্গ লোকদেরকে সম্মান করি এবং তাদের উপদেশবাণী শ্রবণ করি। ইসলামী তা'লীম ও তাহযীবের আলোকে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে ফায়দা গ্রহন করি। তোমরা চিন্তা ফিকির করে দেখো, ইন'শাআল্লাহ তোমাদেরও ফায়দা হবে।

ভবিষ্যতের চমক

আর-রিসালাহ: কয়েক বছর ধারাবাহিক যুদ্ধ করার পর আপনি ক্লান্ত হননি? আপনি কি এটা চিন্তা করেননি যে, যথেষ্ট হয়েছে, এখন আমার বিশ্রাম করা দরকার। এখন এই নতুন প্রজন্ম যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

আমিরে মুসলিম: আমার তো এটা জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা আমার জিহাদী কাজকে কবুল করেছেন কি না - তাহলে আমি কিভাবে বিশ্রাম করবো? আমাদের এ পথে শয়তান কয়েক ধরণের জাল বিছিয়ে রেখেছে। প্রতিটা মুহূর্তে শয়তান আমাদেরকে এ পথ থেকে হটিয়ে গোমরাহ করার পিছনে লেগে আছে। আমি আমার রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর এ পথে এখনো ক্লান্ত হইনি, এটাই আমার পথ।

আর-রিসালাহ: ভবিষ্যতে আপনার পরিকল্পনা কি? আপনি কি নিজেকে চেচনিয়া অভিমুখে রওয়ানা করে তা আজাদ করার বিষয়টি ভাবছেন?

আমিরে মুসলিম: আমি এই ভূমিতে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করা ও শামী মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য এসেছি। এখানের লোকজন আমার খুব পছন্দের। তারা খুব সাদাসিদে ও অতিথীপরায়ণ মানুষ। এখানে আমি নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ পাচ্ছি। এখান থেকে নতুন অনেক কিছু শিখছিও। অচিরেই হয়তো চেচনিয়ার দিকে সফরের মারহালা আসতে পারে এবং এখানে শেখা অভিজ্ঞতাকে অদূর ভবিষ্যতে চেচনিয়ায় নিজেদের লোকদের সাহায্যের জন্য কাজে লাগাতে পারবো ইন'শা আল্লাহ।



মুসলিম উম্মাহর স্বাধীন নারীদের পক্ষ থেকে
উম্মাহর বন্দি বোনদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ

নসিহত

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবাগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের অনুসারীদের উপর।

হামদ ও ছানার পর বন্দি বোনদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা:

মুসলিম উম্মাহর নিকট তাদের নারীরা সম্মান ও ইজ্জতের প্রতীক। চলমান সময়ে উম্মাহর ইজ্জতের প্রতীক এই নারীদের উপর দিয়ে কি ভীষণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা উম্মাহর কারো অজানা নয়। এই ঘটনাবলী বিবেক সম্পন্ন প্রত্যেকটা মানুষের দুশ্চিন্তা ও কষ্টের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উম্মাহর নারীদের বন্দিত্বের ঘটনায় মজবুত ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিদের হৃদয় আজ রক্তাক্ত।

এমন পরিস্থিতিতে আমরা আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনাই করি যে, "হে আল্লাহ! আমরা দুনিয়ার কষ্ট ও পরীক্ষা থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই। দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আমাদেরকে ঈমানের উপর দৃঢ়পদ রাখুন। হে আল্লাহ! আমরা শত্রুদের বিদ্রূপের পাত্র হওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।" কুফফারদের কারাগারগুলোতে উম্মাহর বন্দি নারীদের সাথে কি ধরণের আচরণ হয় সেটা কারো অজানা নয়। আমরা এর থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। এই পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর যে, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও এখানে এসে হোঁচট খেয়ে যান।

পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো এত বিপুল পরিমাণ মানুষকে বন্দি করে রাখা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এই বন্দিদের অধিকাংশই শিশু ও নারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾

"তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।" (সূরা আল-বুরুজ-৮)

সম্প্রতি আমরা আমাদের কতেক কারাবন্দি বোনের কিছু কাজ-কর্ম সম্পর্কে জানতে পেরেছি। দুঃখের বিষয় হচ্ছে এ কাজগুলোতে আমরা তাদের প্রজ্ঞা ও পরিচালনার ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের এই বোনদের ভুলগুলো চিহ্নিত করে শুধরানোর তাওফিক দান করুন। আমিন।

যদিও বোনরা এই কাজগুলো ব্যক্তিগতভাবে করছেন। তবে ভয়ের বিষয় হল তাদের এই কাজগুলোর প্রভাব কারাবন্দি সকল বোনদের উপর পড়ছে। একথা আমরা মেনে নিচ্ছি যে, বোনরা সুনির্দিষ্ট কারণেই এমন কাজ করছেন। কারাগারের এই নির্যাতনের মধ্যে তারা তাদের দ্বীন ও আকিদার সুরক্ষার জন্যই এমনটা করছেন বা অনেকক্ষেত্রে বাধ্য হচ্ছেন। এক্ষেত্রে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের এই কথাগুলো যেন বোনদের জন্য পরামর্শ এবং বন্দি মহিলাদের জন্য দিক-নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টার উত্তম সাহায্যকারী।

প্রথমত:

তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলিম বোনদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর পথ খুব মসৃণ কিছু না। পদে পদে এখানে বিপদ ও প্রতিবন্ধকতা ওঁত পেতে আছে। তাই এ পথের যাত্রী যে হবে তাকে এই দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়েই অতিক্রম করতে হবে। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য এই একই নীতি ।

এ পথে পুরুষদের সাথে সাথে নারীদেরকেও বন্দিত্ব বা হত্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় নারীদেরকে বন্দি করা হয়, তাদের অঙ্গ হানি করা হয়, তাদের এমন সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যার মুখোমুখি হওয়া থেকে অনেক সময় মুমিনা নারীরা মৃত্যুকেই বেশি পছন্দ করে। তারা এসব ত্যাগ-কোরবানি ও পরীক্ষা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দিয়ে থাকেন। আল্লাহর আদেশকে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করার জন্যই তারা এই সকল কোরবানি হাসিমুখে বরন করে নেন।

হানিফিয়্যাহ ধর্মের অনুসরণের কারণে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী "সারাকে" বন্দি করা হয়েছিল। এরপর ফেরাউন তার সাথে অপকর্ম করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাকে ফেরাউন এর কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন।

এই হানিফিয়্যাহ ধর্মের অনুসরণ করতে যেয়ে ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন। সুমাইয়া বিনতে খাওয়াতকে হত্যা করা হয়েছিল শুধুমাত্র এই ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে। এই হানিফিয়্যাহ ধর্মের অনুসরণ করতে গিয়ে উম্মাহাতুল মুমিনিন খাদিজা রা. ও তার মেয়েকে অনাহারে থাকতে হয়েছিল। অনাহারের তীব্রতা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, মক্কার লোকেরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের নারী ও শিশুদের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। এ সকল নারী ও শিশুদেরকে মক্কার কাফেররা আবু তালিবের উপত্যকায় অবরোধ করে রেখেছিল। দীর্ঘদিনের অবরোধ ও অনাহারের কারণে তাদের চিৎকার অবরোধের এলাকার বাইরে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

তাই হে আমার বন্দি বোন!

আপনি কখনোই ভাববেন না যে, এই বিপদ শুধু আপনার উপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে বরং যুগে যুগে যারাই হক্ব কথা বলেছেন এবং হক্বের পথে চলার চেষ্টা করেছেন, তারাই এ ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। আমাদের পূর্ববর্তীগণও এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত যারাই হক্ব পথে চলার চেষ্টা করবে তারাই এই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ যেন আপনাকে এই পরীক্ষায় দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকার তাওফিক দান করেন। আমিন।

এই পথের পরীক্ষার ব্যাপারে বলতে গিয়ে হিরাক্লিয়া (রোমের বাদশাহ) আবু সুফিয়ান রা. কে বলেছিলেন-

'চূড়ান্ত বিজয় আসার আগে এভাবেই আল্লাহর নবীদেরকে পরীক্ষা করা হয়'

দ্বিতীয়ত:

হে বোন!!

যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, আপনি বন্দি হয়ে পড়েছেন (আল্লাহ এমনটা হওয়া থেকে আপনাকে হেফাজত করুন)। তাহলে মনে রাখবেন তখন আপনি তুলনামূলক দুর্বল অবস্থায় আছেন। বান্দার প্রতি আমাদের রবের এটা একটা বিশাল অনুগ্রহ যে, তিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী হুকুম দিয়েছেন। পরিস্থিতির সাথে সাথে হুকুমের সহনশীলতা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য বিরাট এহসান।

বান্দা যদি কোন কাজ বাধ্য হয়ে করে বা তাকে দিয়ে জোরপূর্বক করানো হয় তবে তার ক্ষেত্রে শরিয়তের হুকুম ভিন্ন। এমনকি বান্দা কি অবস্থায় আছে? অথবা বান্দা যে জামাআ'তের অন্তর্ভুক্ত সে জামাআ'তের অবস্থা কেমন? সেটাও শরিয়ত বিবেচনা করেই হুকুম প্রদান করে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন-

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শুকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।" (সূরা বাকারা- ২: ১৭৩)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন –

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত হয়, এবং যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ। যে জন্তু যজ্ঞবেদিতে যবেহ করা হয় (অর্থাৎ, যা মূর্তি পূজার বেদিতে বলি দেয়া হয়) এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর (জুয়ার তীর) দ্বারা বন্টন করা হয়, এসব গোনাহের কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল।"

(সূরা আল-মায়দা- ৫ : ৩)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সুন্নাহ থেকেও আমরা এই বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তাছাড়া হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির রা. এর ঘটনার মাঝেও রয়েছে এই বিষয়ক একটি দিক-নির্দেশনা।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلاَمَهُ سَبْعَةٌ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلاَّ بِلاَلاً فَإِنَّهُ قَدْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ .

অর্থ: আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত: সর্বপ্রথম সাত ব্যক্তি নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। তারা হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রা., আম্মার রা., তাঁর মাতা সুমাইয়্যাহ রা., সুহায়ব রা., বিলাল রা. ও মিকদাদ রা.। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা আবু বকর রা.-এর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন তার স্বগোত্রীয়দের দ্বারা। অবশিষ্ট সকলকে মুশরিকরা আটক করে। তারা তাদেরকে লৌহবর্ম পরিধান করিয়ে প্রখর রোদের মাঝে চিৎ করে শুইয়ে দিত। তাদের মাঝে এমন কেউ ছিল না, যাকে দিয়ে তারা তাদের ইচ্ছানুসারে স্বীকারোক্তি করায়নি। কেবল বিলাল রা. নিজেকে আল্লাহ্র রাস্তায় অপমানিত করেন এবং লোকেরাও তাকে অপমানিত করে। তারা তাকে আটক করে বালকদের হাতে তুলে দিত। তারা তাকে নিয়ে মক্কার অলিতে-গলিতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো এবং তিনি শুধু 'আহাদ' 'আহাদ' (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক) বলতেন। (সুনানে ইবন মাজাহ – ১৫০)

উপরোক্ত হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মক্কার মুশরিকরা আম্মার ইবন ইয়াসির রা. কে বন্দি অবস্থায় তাদের পছন্দ অনুযায়ী কুফুরি কথা বলতে বাধ্য করেছিল।
অতঃপর আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

"মিথ্যা কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী। (১০৫) যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত, যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি।"

(সূরা আন-নাহল- ১৬: ১০৫-১০৬)

ইবন আব্বাস রা. বলেন:

“মুশরিকরা আম্মার রা. তাঁর মাতা সুমাইয়্যাহ রা., সুহায়ব রা., বিলাল রা., খাব্বাব ও সালিম রা. কে নিয়ে নির্যাতন করেছিল। সুমাইয়্যাহ রা. কে দুটি উটের মাঝে বেঁধে রেখে তার যৌনাঙ্গে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল: ‘তুমি পুরুষদের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছো’। এরপর তাকে হত্যা করা হয়েছিল। সুমাইয়্যাহ রা. এর সাথে তার স্বামীকেও হত্যা করা হয়েছিল। এই দুইজনকে ইসলামের প্রথম দুই শহীদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়”।

আম্মার রা. কে অত্যাচার পূর্বক মুশরিকরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী কুফুরি বাক্য বলতে বাধ্য করেছিল। পরবর্তীতে তিনি আল্লাহর রাসুলের কাছে এই বিষয়টি তুলে ধরেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে (আম্মারকে) জিজ্ঞাসা করেছিলেন- “এই (কুফরী) বাক্যগুলো বলার সময় তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন ছিল?”। আম্মার রা. উত্তরে বললেন – “আমার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল”। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন - “যদি আবার তারা তোমার সাথে এমন করে তবে তুমি যেমন বলেছিলে তেমনই বলবে”। (আল-আকিম এটিকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী এটা সহীহ।)

ইবন আব্বাস রা. আরো বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন –

“আল্লাহ আমার উম্মতকে তাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলে যাওয়ার কারণে যে ভুল হয় তা থেকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, এবং জোরপূর্বক যে অপরাধ করানো হয় সেগুলো থেকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন।” (আল হাকিম ছাড়াও ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান এর মত অনুসারে এটি সহীহ)।

উপরোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা এ কথা সু-স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে বোনরা এখন বন্দি অবস্থায় আছেন তাদের জন্য শরিয়তের হুকুম হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির রা. এর বন্দি অবস্থার হুকুমের মতই হবে। যেহেতু তারা বন্দিত্বের মত একটি দুর্যোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, তাই তাদের জন্য দুর্যোগকালীন হুকুমই প্রযোজ্য হবে।

এটা নিশ্চিত যে, যে বোন কারাগারে নির্যাতন, ধর্ষণ এবং আল্লাহর শত্রুদের দ্বারা নানা ধরণের অপমানের স্বীকার হচ্ছেন, তার অবস্থা সেই বোনের মতো নয়, যে বন্দি অবস্থার এই নির্যাতন ও অপমান থেকে মুক্ত। যে বোন মুক্ত আছেন তাকে দিয়ে কেউ জোড় করে কোন কিছু করিয়ে নিতে পারে না। অর্থাৎ কারাগারে থাকা আর মুক্ত থাকার মধ্যে পার্থক্য শুধু ‘স্বাধীনতার’। একজন স্বাধীনভাবে সবকিছু করতে পারছেন, আরেকজন বাধ্য হয়ে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

তৃতীয়ত:

হে বোন! আপনি যদি বুঝতে পারেন যে, আপনি দুর্বল অবস্থায় আছেন, তবে আপনার এই অবস্থায় কি করতে হবে তা জানা থাকা উচিত। এই ব্যাপারে আলেম-উলামাদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে সেগুলো মানার চেষ্টা করা। এই ধরণের পরিস্থিতিতে নিচের মূলনীতি অনুযায়ী করণীয় ঠিক করতে হবে। মূলনীতিটি হচ্ছে-

“সুবিধা অর্জনের’ চেয়ে ‘ক্ষতির প্রতিরোধ করাটা’ অগ্রাধিকার পাবে।”

অর্থাৎ পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, ক্ষতিকর বিষয়টি প্রতিরোধ করে একই সাথে সুবিধা অর্জন অসম্ভব হয়। তখন ‘ক্ষতি প্রতিরোধ করা’ অগ্রগণ্য হবে ‘সুবিধা অর্জনের’ উপর।
এটা এই কারণে যে, শরিয়ত সর্বদা ইতিবাচক আ’মল পালন করার চাইতে নেতিবাচক কাজ থেকে বিরত থাকাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বর্তমানে এই মূলনীতি আমাদের বন্দি বোনদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে।

কোনো কোনো বন্দি বোনদের থেকে এমন কিছু কাজ প্রকাশ পায়, যা আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও পরবর্তীতে দেখা যায় যে, অল্প কিছু সুবিধার জন্য তা বাকি বন্দিদের জন্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। এই ধরণের কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য চাই।

কিছু বোন তো আছে (আল্লাহ তাদের দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন) যারা বন্দি অবস্থায়ও জিহাদের ডাক দেন! এটি কেমন জিহাদ? বুঝা ই যাচ্ছে (আল্লাহ এই বোনদের হেফাজত করুন)।

কিছুদিন আগে আমাদের নিকট এক বোনের বার্তা এসেছিল। সেখানে তিনি ইসলামিক স্টেটের সৈন্যদের হয়ে তাদের উপর নির্যাতন পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার ভাষ্যমতে - মুজাহিদ ভাইরা যখন আমাদের জন্য যুদ্ধ করেছে তখন তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমাদের ধারালো অস্ত্রগুলো প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। আমরা গুলি ও বিস্ফোরণের শব্দ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

আল্লাহর শপথ! এই ধরণের কাজ-কর্ম সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি কতটুকু লোপ পেলে এই ধরণের কাজ করতে পারে। বন্দিশিবির পরিচালনাকারীদের হাতে এমন মোক্ষম সময়ে কে অস্ত্র তুলে দেয়? একজন মানুষ কীভাবে তার বন্দি বোনদের নির্যাতনের মাত্রাবৃদ্ধির কাজে জালিমদের সাহায্য করেন? যেখানে চলমান নির্যাতনের প্রচণ্ডতায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। বন্দি বোনদের উপর নির্যাতন চালানোর বৈধতা দেয়ার জন্য সংবাদমাধ্যমগুলো এই বার্তাগুলোকে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে জেলাররা সংবাদমাধ্যম ও আম-মানুষের সমর্থন পেয়ে মহিলা বন্দিদের নির্যাতন করার

লাইসেন্স পেয়ে বসেছে।

যুক্তির খাতিরে যদি আমরা মেনেও নেই যে, জেলে বসেই আপনি জিহাদ করতে চাচ্ছেন। এ উদ্দেশ্যে দুই-একজন সৈন্যর উপর আক্রমণ চালানো হল বা হত্যা করা হল। এই দুই-একজন হত্যার বিনিময়ে আপনি কি পেয়েছেন?

অভিবাসী বোনদের উপর নিয়ম-কানুন আরো কড়াকড়ি হওয়া ছাড়া আর কিছু কি পেয়েছেন? এই বোনরা এখন বাজারে যাওয়া এবং চিকিৎসা গ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন। গরমের দিনগুলিতে পানি এবং বরফ সংগ্রহের যে অনুমতি পূর্বে দেওয়া হয়েছিল তা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ, পরিদর্শন এবং অপমান করার মাত্রাও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের কিছু বোন আছেন যারা এখনো খিলাফত ও প্রতিষ্ঠিত শক্তির সংশয়ে রয়ে গেছেন।(আল্লাহ এই বোনদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন)। এই বোনরাই মূলত এই ধরণের কাজ-কর্ম করে থাকেন।

বাতিলের মুখোমুখি হয়ে দুর্বল ও পরাজিত ঈমান নিয়ে দৃঢ়তার সাথে দাড়িয়ে থাকাটা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় ইবাদত এবং সৎকর্মের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সৎকর্ম। তবুও এক্ষেত্রে বোনদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে আদেশ দিয়েছেন তার সীমা অতিক্রম হয়ে যাচ্ছে কিনা? সেদিকে খেয়াল রাখা। আমাদেরকে এব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে যে, অতি উৎসাহী হয়ে আমরা ইবাদতের ক্ষেত্রে সংযোজন বা বিয়োজন করে ফেলছি কিনা। কারাগারের ভিতরে কিছু বোনদের দ্বারা হুদুদ [ইসলামি শাস্তি ব্যবস্থা] কার্যকর করতে শোনা যায়। এটা শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ নয়। আলেম-উলামাদের মতে - হুদুদ [শাস্তি] প্রতিষ্ঠা করবে মুসলিমদের ইমাম বা তার প্রতিনিধিদগণ।

আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে যে, এক বোন কারাগারে অন্য একজনের একটি মানিব্যাগ চুরি করেছে। পরে আবার তা ফেরতও দিয়েছিলেন। কিন্তু কারাগারে হুদুদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছু বোন চুরির শাস্তিস্বরূপ ঐ বোনের হাত কেটে দিয়েছে।

আমরা জানি যে, চুরির শাস্তি কার্যকর করার জন্য দশটি শর্ত রয়েছে। এখন যারা এই শাস্তি দিয়েছেন তাদের নিকট আমার প্রশ্ন – যে বোনের হাত কাটা হয়েছে তার ক্ষেত্রে কি এই দশটা শর্ত পূরণ হয়েছিল?

আমি এব্যাপারে নিশ্চিত যে, যেই বন্দি শিবিরে এই শাস্তি কার্যকর করা হয়েছে, সেখানের সকল বোনকে এক এক করে জিজ্ঞেস করলেও কেউ এই দশটি শর্তের কথা বলতে পারবে না।

হে বোন! আল্লাহকে ভয় করুন!!

হে বোন! আপনার জন্য কি উচিৎ ছিলনা যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হুদুদ প্রতিষ্ঠার এই দায়িত্ব যার উপর অর্পণ করেছেন তার হাতেই ছেড়ে দেওয়া? আপনার জন্য কি এটা শোভনীয় নয় যে, আপনি নিজেকে যিকর-আজকার ও সন্তান প্রতিপালনের কাজে ব্যস্ত রাখবেন?

হে বোন! আল্লাহকে ভয় করুন! আল্লাহকে ভয় করুন!! নিজের কাজের ক্ষেত্র ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন।

বোন! দয়া করে বোনদের সম্মান বজায় রাখার স্বার্থে আপনার জিহ্বাকে সংযত রাখুন। দয়া করে যাদের সাথে আপনার মতের মিল হচ্ছে না, তাদেরকে 'মুরতাদ' ও 'কাফির' অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

দেখুন বন্দিশিবিরে এমন একজন শিক্ষিতা বোনের প্রতি অন্য বোনরা এই কেমন আচরণ করছেন, যিনি আরবী ভাষা ও কুরআনের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। যিনি মুজাহিদীনের সন্তানদেরকে কোরআন শিক্ষা দেন এবং তাদের দেখা-শোনা করেন। এই বন্দিশিবিরে অজ্ঞ মহিলারা বুদ্ধিমান এই শিক্ষক বোনকেও তাকফির করতে ছাড়েনি।

হে বোন! আপনারা এই শিক্ষিকা বোনকে তাকফির করছেন এবং তাকে তওবা করতে চাপ প্রয়োগ করছেন। এর মাধ্যমে আপনারা আল্লাহর জমিনে কী প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন?

আবার কখনো শোনা যায় যে, তাকফিরকারী এই বোনদের কেউ কেউ তাঁবুতে বসে থাকেন। আর এ সময়ে আমাদের কোন বোন যদি কোন সংস্থার সাহায্য করার জন্য তাদের কাছে যান, তখন তাকফিরকারী বোনরা তাদেরকে অবিশ্বাসী, আল্লাহর দুশমন ইত্যাদি নামে সম্বোধন করে থাকেন।
আপনারা দাবি করছেন যে, আপনারা ইলম ওয়ালা। অথচ আপনারাই এ সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধি- বিধান না জেনেই আলাপ- আলোচনা করে থাকেন।

আপনি কি জানেন? যে, তাওহীদবাদী প্রবীণ আলেমরা বন্দিশিবিরের বন্দিদের সাহায্যের নিয়তে সংগঠনের পক্ষ হয়ে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন। যেহেতু কারাগারগুলোতে দুর্দশা, নির্যাতন ও অনাহারের আশংকা বেশি তাই আলেম-উলামারা এই ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে থাকেন। তবে কোন সংস্থার হয়ে কাজ করার ক্ষেত্রেও তারা কয়েকটি শর্ত দিয়ে থাকেন।

শর্তগুলো হল:

১. কুফর বা মন্দ কাজে সংগঠনকে সহায়তা করা যাবে না।

২. ফেতনার প্রতি নিজেকে প্রকাশ করা যাবে না।

৩. তাদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করা যাবে না।

৪. বন্দি বোনদের ক্ষতি করে সংস্থাকে সাহায্য করা যাবে না।

সবচেয়ে বড় কথা হল এই সংস্থার বোনটিকে বন্দি বোনদের সাহায্য করার জন্য কে নিযুক্ত করেছিলেন? সেটা আপনাদের জানা ছিল কি?

হে বোন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সে ব্যাপারে সতর্ক হন। বিশেষ করে আপনার ও আপনার সন্তারদের ব্যাপারে আল্লাহ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সে ব্যাপারে সতর্ক হন।

হে বোন! আপনি নিজ তাঁবুতে অবস্থান করুন। মুসলমানদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।(আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন)। যদি আপনি আপনার কোন বোনকে মন্দ কাজ করতে দেখেন, তবে তাকে বিনয় ও সহনশীলতার সাথে বুঝিয়ে দিন। তার সামনে প্রমাণগুলো উপস্থাপন করুন। তাকে প্রমাণ সহকারে প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ দিন। আপনার দ্বারা ধর্মের বিষয়ে বাড়াবাড়ি হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ইসলামিক স্টেট(আই. এস) আজকের এই দুরবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সেই সাথে আমাদেরকেও এমন এক বিপদসংকুল ফেতনা মুখর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে।

বোনদের মধ্যে যারা এক সময় আমাদের পথের সঙ্গী ছিলেন এবং পরবর্তীতে ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছেন তাদের প্রতি আমার বার্তা -

আল্লাহর শপথ, আপনারা আমাদের হৃদয় ভেঙে দিয়েছেন। আপনাদের কাজকর্মের কারণে আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমাদের কালো চুল পেরেশানিতে সাদা হয়ে গেছে। আপনাদের সাথে আমাদের যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, সেখান থেকে আপনারা বের হয়ে বর্তমানের বাজে অবস্থায় চলে গেছেন। এর জন্য আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

আল্লাহর শপথ, আমাদের থেকে আপনাদের ভিন্ন পথে চলাটা যতটুকু কষ্ট দিয়েছে, তার চাইতে বেশি কষ্ট দিয়েছে আপনাদের বিশ্বাসঘাতকতা। আমরা খুবই কষ্ট পেয়েছি এইজন্য যে, আপনারা মুজাহিদীনের ভবিষ্যৎ বংশধর ও তাদের সন্তানদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছেন।

তবে আপনাদের দ্বারা এই ধরণের ঘটনা আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর হকের ব্যাপারে উদাসীন থাকবে, তার দ্বারা বান্দার হকের ক্ষেত্রেও গাফলতি প্রকাশ পাবে এটাই স্বাভাবিক।

انا لله وانا اليه راجعون

নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

হে আল্লাহ! আমাদের বন্দি বোনদের মুক্ত করে দিন। হে আল্লাহ! তাদেরকে দ্বীনের উপর অটল অবিচল রাখুন এবং তাদেরকে উত্তম বদলা দান করুন। তাদেরকে এই কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ সহজ করে দিন। আমীন।

واخر دعواناأن الحمد لله رب العالمين وصلي الله تعالي علي خير خلقه محمد وعلي آله وصحبه أجمعين

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর। সালাম ও দুরুদ আখেরি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামের উপর।

অনুবাদ: মেহেদি হাসান

পতনের দ্বারপ্রান্তে গণতান্ত্রিক ইসলামী আন্দোলন



২য় পর্ব

শাইখ আবু আব্দুর রহমান শানকিতি হাফিজাহুল্লাহ

এক লেকচারার তার লেকচারে বলেন, আমরা গণতান্ত্রিক সিস্টেমে অংশগ্রহণ করেছি এই হিসেবে যে, তা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার একটি মাধ্যম। এই গণতন্ত্রই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

আমি তাকে বলতে চাই, একইভাবে পাশ্চাত্যের কুফরী শক্তিও গণতন্ত্রকে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছার একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই গণতন্ত্র তাদেরও চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

কিন্তু সমস্যার বিষয় হল, লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্যের মধ্যকার পার্থক্য একটি আপেক্ষিক বিষয়। মাধ্যম কখনো কখনো অতি প্রয়োজনীয় হলে লক্ষ্যে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা চূড়ান্ত লক্ষ্যের একটি অংশ হিসেবে উপস্থিত থাকে। এটাই ঘটেছে বর্তমান গণতন্ত্র এবং তার ধ্বজাধারীদের সঙ্গে!

এখানে অতি পরিচিত এই নীতিটা আমরা আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই- "সৎ উদ্দেশ্য মাধ্যমকে বৈধতা দান করে" -এই মতবাদ বা নীতিকথা দ্বীন-ইসলামের ভেতর নেই। এই নীতি মেকিয়াভেলিবাদ-এর।

ইসলাম ধর্মে কেবল সে সকল মাধ্যম ও উপায়-ই বৈধ, যেগুলো প্রকৃতিগতভাবে অনুমোদিত, অথবা যেগুলোর সঙ্গে বৈধতার উপযুক্ত কারণ যুক্ত হয়েছে।আর এ উভয়টিই গণতন্ত্রে অবিদ্যমান।

কারণ একে তো গণতন্ত্র নিজেই বৈধ নয়,তার ওপর তার সঙ্গে এমন অনেক কিছুই যুক্ত হয়েছে, যার দরুন তা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। তেমনি একটা কারণ হচ্ছে, "শিরক" (শরয়ী) ইকরাহ বা বাধ্যবাধকতা ছাড়া অন্য কোন কারণে শিরক (প্রদর্শন) করার সুযোগ নেই। এসংক্রান্ত বিধান আমরা সামনে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ!

আমাদের জানা থাকা চাই যে,যারা এই গণতন্ত্রকে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্যের মাধ্যম মনে করছে, তারা বুঝে হোক না বুঝে হোক, আল্লাহর দ্বীনের সঙ্গে অন্যায় করছে।

সে উপকার করতে চাইল, কিন্তু নিজের অনিচ্ছায় ক্ষতি করে বসল নিশ্চয়ই কিছু কিছু ভালো কাজ দিনশেষে হয়ে থাকে অন্যায়!

তারা আল্লাহর দ্বীনের সঙ্গে প্রথমত এভাবে অন্যায় করেছে যে, আল্লাহর দ্বীন বিরোধী ব্যবস্থা দ্বারা ইসলামকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। এই বিরোধিতা বাহ্যিকভাবে যেমন, তেমনি আভ্যন্তরীণ ভাবেও। তাদের অবস্থা ওই ব্যক্তির মত, যে তেল দ্বারা আগুন নেভাতে চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়ত: তারা অন্যায় এই করেছে যে,তারা আল্লাহর অবাধ্যতা দ্বারা আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করতে চেয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টিকারী মাধ্যম দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চেয়েছে। এতে করে তাদের অবস্থা ওই ব্যক্তির কর্ম সদৃশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে প্রস্রাব দিয়ে অপবিত্রতা দূর করতে চেষ্টা করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ারহিমাহুল্লাহ-কে একবার এক শায়খ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যিনি কবিরা গুনাকারীদের জন্য তবলা সহকারে শরীয়ত সম্মত কবিতা শ্রবণের অনুমতি দেন। আর এর ফলে কবিরা গুনাকারীদের মধ্যে অনেকেই তওবা করে ফেলে। যেহেতু এই কাজে বাস্তবেই কল্যাণ রয়েছে, তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন কাজ হালাল কি-না?

তিনি জবাবে বলেন:

“যে কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পথভ্রষ্টদেরকে হেদায়েত দান করেন, বিভ্রান্তদেরকে সুপথ দান করেন, যে কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পাপাচারীদের তওবা কবুল করেন, তা এমন কিছু হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

আলোচ্য শায়েখের উদ্দেশ্য হল, লোকেরা যাতে কবিরা গুনাহ থেকে তওবা করে ফেলে। আর এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে তিনি এমন বিদআত-পন্থার আশ্রয় নিয়েছেন, যা প্রমাণ করে, তিনি শরীয়ত সম্মত পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ কিংবা সে বিষয়ে অক্ষম। বস্তুত শরীয়ত সম্মত পন্থাতেই গুনাহগারদের তওবা করা সম্ভব। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এদের চেয়েও নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠ অনাচারী কাফের সম্প্রদায়কে শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহর সাহায্যে এই শরীয়তসম্মত পন্থার বাইরে তারা অন্য কোন নব উদ্ভাবিত অনৈতিক পন্থার আশ্রয় নিতে বাধ্য হননি।শরীয়তের অকাট্য ও অপরাপর বর্ণনা দ্বারা এ বিষয়ে আমরা সকলেই জানি যে, আল্লাহর ইচ্ছায় যারাই কুফর, অন্যায় ও পাপাচার থেকে তওবা করেছে,শরীয়ত সম্মত পন্থা অনুসরণের ফলেই তাদের পক্ষে এমনটি সম্ভব হয়েছে। এর জন্য তাদেরকে কোনরূপ নব আবিষ্কৃত অন্যায় বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে হয়নি।”

শাইখুল ইসলাম আরও বলেন:

“উক্ত শায়েখের জন্য এজাতীয় হারাম কিংবা মাকরূহ পন্থাকে এবাদত এবং আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির মাধ্যম বানানো জায়েজ নেই।”

তিনি আরো বলেন: “নিশ্চয়ই উক্ত ব্যক্তি উলামায়ে ইসলামের সর্বসম্মতিক্রমে পথভ্রষ্ট ও [আল্লাহর দ্বীনে] অপবাদ লেপনকারী। এমন ব্যক্তি মুসলমানদের ঐক্যমত্যের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী।”
(মাজমুউল ফাতাওয়া: ১১/৬২০)

‘আখেরু সা'আ' ম্যাগাজিনে এক নর্তকীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে: “পাশ্চাত্যের আদলে এভাবে নৃত্য করা সম্পর্কে তোমার মতামত কি? এ কাজ কি হারাম??”

তখন সে জবাবে বলল: “নৃত্য একটি শিল্প। আর শিল্পচর্চা ইবাদত। অতএব আমার এই নৃত্য একটি এবাদত। আমি যখন নৃত্য করতে থাকি, তখন ওই অবস্থায় আমি আল্লাহর জিকিরে থাকি।”

জি হ্যাঁ পাঠক ...!
নৃত্য কি-না ইবাদত ...!
একইভাবে গণতন্ত্র হলো ইবাদত ...!
আর নৃত্য যেহেতু একটি আর্ট ও শিল্প,তাই এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন সম্ভব?

একইভাবে গণতন্ত্র ও মানব রচিত সংবিধান যেহেতু ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যম,তাই তাতে অংশগ্রহণও আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির চাবিকাঠি।(?)

আল্লাহর শপথ! একজন মুসলমান সারাটা জীবন নর্তকী ও গায়ক বন্ধুদের মাঝে কাটানোটা একমুহূর্ত মানব রচিত সংবিধানকে সংবিধান হিসেবে মেনে নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে উত্তম।

হে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা!

ক্ষমতার মসনদে পৌঁছার জন্য মানব রচিত সংবিধানকে মেনে নেয়া যদি আপনাদের জন্য বৈধ হয়, তবে আপনারা বলুন তো, এই ক্ষমতায় যাবার জন্য ব্যভিচারকে কি আপনারা বৈধ মনে করেন? ক্ষমতায় পৌছাবার জন্য সুদী কারবারকে কি আপনারা বৈধ মনে করেন?

সেমিওটিক্স ও আলকেমি বা চিহ্নতত্ত্ব ও রসায়নসহ আরো বিভিন্ন অসার তত্ত্বের শিক্ষা লাভ করাকে ক্ষমতায় পৌছাবার জন্য আপনারা বৈধ মনে করেন? নিশ্চয়ই করেন? আর কেনই বা করবেন না? মানব রচিত সংবিধানের অধীনস্থতা মেনে নেয়ার চেয়ে এসব অন্যায় তো আর অধিক গুরুতর ও জঘন্য নয়।

ইমাম আহমদরহিমাহুল্লাহ-কে একবার বলা হল: এক মহিলা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। কিন্তু স্বামী এতে রাজি না। তখন ওই মহিলাকে কতিপয় কৌশলী লোক বলল: “যদি তুমি মুরতাদ হয়ে যাও, তবে তুমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে।”

তখন মহিলা তাই করল।ঘটনা শুনে ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ রেগে গেলেন এবং বললেন: “যে এমন ফতোয়া দেবে, অথবা এজাতীয় কৌশল শিখাবে, কিংবা এমন ফতোয়ার প্রতি সম্মতি প্রকাশ করবে, সে কাফের”।

বিনতে আবি রূহ। আবু গাসসানের বিবাহবন্ধনে থাকাকালে এই মহিলাকে মুরতাদ হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তখন এই মহিলা মুরতাদ হয়ে যায়। এতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হয়। আর ওই মহিলাকে কারাদণ্ড দেয়া হয়। এই ঘটনা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রেগে গিয়ে বলেন: “যে ব্যক্তি তাকে এমন পরামর্শ দিয়েছে, সেও কাফের।আর পরামর্শদানের জন্য ওই পরামর্শ সংবলিত চিঠি যার কাছে রয়েছে অথবা যার ঘরে রয়েছে, সেও কাফের। ওই চিঠি যে ব্যক্তি নিজের কাছে রেখেছে, কিন্তু সে এমন পরামর্শ দেয়নি, সেও কাফের।” (ইগাসাতুল লাহফান)

বর্তমানে পুরোপুরিভাবে এ-ই মহিলার মত অবস্থা হলো গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের, যারা যেকোনো পন্থায়, এমনকি শিরক করে হলেও ক্ষমতায় যেতে চায়। কিন্তু এই মহিলা তো রিদ্দা থেকে তওবা করে নিজ ধর্মে ফিরে এসেছে। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা

কবে আর তওবা করে নিজেদের ধর্মে ফিরবে?! আমাদের খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, আজ যারা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বৈধ অবৈধ নির্বিশেষে যেকোনো উপায় ও পন্থা গ্রহণের কথা বলছে, হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম যদি তাদের ব্যাপারে জানতেন, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে একশ' বেত্রাঘাত করার জন্য শপথ করতেন,যেমনটা তিনি নিজ স্ত্রীর ক্ষেত্রে করেছেন একই কারণে। ঘটনা হলো, তাঁর স্ত্রীর কাছে ইবলিস ডাক্তার সেজে এসেছে। তখন স্ত্রী স্বামী আইয়ুবের (আ.) চিকিৎসার জন্য তাকে ডাকেন। তখন ইবলিস বলে, "আমি এই শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, সুস্থ হলে তিনি বলবেন, 'তুমি আমাকে সুস্থ করেছ' এছাড়া আর কোন প্রতিদান আমি চাইনা"। তখন স্ত্রী এতে সম্মত হয়ে যান। অতঃপর যখন আইয়ুব আলাইহিস সালামকে এ কাজের পরামর্শ দেন, তখনই স্ত্রীকে মারার জন্য তিনি শপথ করেন। (ইমাম শাওকানী প্রণিত ফাতহুল ক্বাদীর)

৩ নং সংশয়ঃ গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই।

একদল আছে তারা আজব প্রশ্ন করে। তারা বলে, "আচ্ছা গণতন্ত্রের কি কোনো বিকল্প আছে? গণতন্ত্র বাদ দিয়ে এই মুহূর্তে আমরা আর কি-ই বা করতে পারি?!"

সুবহানাল্লাহ! যে গণতন্ত্রের কথা শোনেননি নবীজি ﷺ,না শুনেছেন সাহাবায়ে কেরাম, পবিত্র তিন যুগ কিংবা তারও পরে সলফে সালেহীনের কেউ, আজ সে গণতন্ত্রই হয়ে গেছে বিকল্পহীন। তা-ই আজ আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা ও খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে(!)।

সে সকল ব্যক্তিকে আমি বলতে চাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে কি আপনাদের জন্য উত্তম আদর্শ নেই? সাহাবায়ে কিরামের মাঝে কি আপনাদের জন্য চেতনার পাথেয় নেই?? তাদের দিকে লক্ষ্য করুন না!! কিভাবে তারা আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করেছেন? কিসের সাহায্যে করেছেন?? তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন না! তাদের পদরেখা অনুযায়ী চলুন না!! তাদের কারো কর্মপন্থায় কি এজাতীয় ভ্রান্ত নবআবিষ্কৃত মতবাদ ও মতাদর্শের কোন চিহ্ন ছিল?!

আপনি যদি [সত্যিকার অর্থে এবং আন্তরিকভাবে] গণতন্ত্রের বিকল্প খোঁজেন, আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য গণতন্ত্রের বাইরে অন্য কোন উপায় ও কর্মপন্থা অনুসন্ধান করেন, তবে শুনুন, আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্যের কর্মপন্থা প্রধানত তিনটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১. দাওয়াহ্, ২. ইলম ও ৩. জিহাদ।

১. দাওয়াত ঈমানকে পরিপক্ক ও গভীরতা দান করবে।
২. ইলম সুপথ দেখাবে ও ভ্রান্তি থেকে ফিরিয়ে রাখবে।
৩. জিহাদ শত্রুকে নিবৃত্ত করবে ও সত্যকে সমুন্নত করবে।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যেকোন দলকে এই তিনটি কাজ অবশ্যই করতে হবে। তাদের ঈমানগর্ভ অন্তর লাগবে, জ্ঞানগর্ভ মেধা লাগবে এবং শক্তিশালী প্রতিরোধ ক্ষমতা লাগবে। অতএব ইলম ও জিহাদ ছাড়া কেবল ঈমানের ভিত্তির উপর ইসলামী রাষ্ট্র' স্থায়ী হবে না। একইভাবে ঈমান ও জিহাদ ছাড়া কেবল ইলমের ভিত্তির উপর ইসলামী রাষ্ট্র স্থায়িত্ব লাভ করবে না। যেমন নাকি ঈমান ও ইলম ছাড়া কেবল জিহাদের উপর তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না।

অতএব এই তিনটি ভিত্তির মাঝে সমন্বয় লাগবে যেমনটা করেছেন নবীজি ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম। তারা কোনটিতেই অবহেলা করেননি।সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম বিশ্বের আনাচে-কানাচে কিতাব এবং তলোয়ার বহন করে নিয়ে চলেছেন। কিতাবের সাহায্যে সত্যান্বেষী ব্যক্তিদেরকে পথ দেখিয়েছেন আর তরবারির সাহায্যে অবাধ্য দুরাচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। এ তিনটের মধ্যে তারা কখনও পার্থক্য করেননি।

কিন্তু এই গণতন্ত্র, তাতে না আছে ঈমান, না আছে ইলম আর না আছে জিহাদ। এটা মূলত এমন কিছু শক্তি ও প্রক্রিয়া, যা বিকৃত বীভৎস পন্থায় চর্চা করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, এই তিনটি রোকনের মাঝে সর্বাধিক বিলুপ্ত রোকনটি হলো —জিহাদ। হ্যাঁ এটিই সেই বিলুপ্তপ্রায় বিকল্প, যার সাহায্যে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা সর্বযুগে সর্বত্র দ্বীনকে সাহায্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ

আর যদি মানবজাতিকে তাদের এক দলের দ্বারা অন্য দলকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র না থাকতো তা হলে নিশ্চয়ই বিধবস্ত হয়ে যেত গির্জাগুলো ও মঠগুলি ও উপাসনালয় ও মসজিদ সমূহ যেখানে আল্লাহ্‌র নাম প্রচুরভাবে স্মরণ করা হয়!

জি হ্যাঁ, এই জিহাদই একমাত্র আবশ্যক বিকল্প। এটাই সর্বোৎকৃষ্ট নির্বাচন। এটাই চূড়ান্ত ও নিশ্চিত সমাধান।
কিন্তু এক শ্রেণী কেবল নির্ঝঞ্ঝাট, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও শান্তিপূর্ণ বিকল্প আশা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

...وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم

অর্থ: আর তোমরা কামনা করো, যেন কন্টকহীন [দল] তোমাদের জন্য [মুখোমুখি] হয়।

শায়খ মুজাহিদ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ বলেন:

"জিহাদ ভিন্ন অন্য যেকোনো পন্থা কেবলই অধঃপতন ও ক্ষতি ডেকে আনবে।যারা নির্বাচনের সাহায্যে ইসলামী ভূমিগুলোকে স্বাধীন করার চেষ্টা করছেন; যে নির্বাচন ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের

উপর প্রতিষ্ঠিত কিংবা ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিন দিয়ে দেবার সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বাধীনতাকামী সে লোকগুলো ফিলিস্তিনের একটি বালুকণাও স্বাধীন করতে পারবে না। বরং তাদের এই চেষ্টা প্রচেষ্টা জিহাদকে করবে ক্ষতিগ্রস্ত ও মুজাহিদদেরকে করবে অবরুদ্ধ।"

এবার আসুন, গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় দেখি: [ইসলামি আইনশাস্ত্র এ বিষয়ে কী বলে]

বিকল্পের ব্যাপারে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে, সে প্রশ্নের উপর তো শরীয়তের হুকুম নির্ভর করে না, আর না তা কোন সমাধান দেবার মত বিষয়।

বরং শরিয়তের হুকুম নির্ভর করে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তরের ওপর-"গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করা কি জায়েজ?"

যদি তা জায়েজ হয়, তবে তো বিকল্পের প্রশ্ন করা নিরর্থক। আর যদি তা হারাম হয়,তবে তো একটি উপায় ও মাধ্যম হিসেবে এই গণতন্ত্রকে গণ্য করা উচিত হবে না; শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যেহেতু তার কোন অস্তিত্ব নেই। আর একটি মূলনীতি রয়েছে —

المعدوم شرعا كالمعدوم حسا

অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে যা অস্তিত্বহীন, বাস্তবেও তা অস্তিত্বহীন বলে ধরে নেয়া হবে।

প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, গণতন্ত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমোদিত কোন বিকল্প মাধ্যম নয়। বরং উল্টো তা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ও ইসলাম ধ্বংসের একটি সুচারু বিকল্প মাধ্যম।

পাশ্চাত্যের কুফরি শক্তি কর্তৃক প্রণীত ইসলাম ধ্বংসের এটি একটি অপকৌশল, যা আব্রাহার কথা মনে করিয়ে দেয়। আব্রাহা কাবা ধ্বংস করতে আসার আগে মা'বাদ আল ক্বালিস নির্মাণ করেছিল বাইতুল্লাহর বিকল্প হিসেবে।একইভাবে পাশ্চাত্যের কুফুরী শক্তি ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় এ পদক্ষেপটিতে রয়েছে

১. মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্র রপ্তানি করা এবং তা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া, যাতে শরীয়তের বিকল্প হিসাবে তা কাজ করে।
২. ইসলামপন্থীদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার সবক দেয়া।

ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাশ্চাত্যের কুফুরী শক্তির প্রথম পদক্ষেপটিতে ছিল:

১. মানব রচিত বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মুরতাদ শাসকবর্গকে সমর্থন দেয়া।

২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের প্রথম প্রজন্মের জন্ম দেয়া।

৪ নং সংশয় : রাজনৈতিক ক্ষেত্র লোকশূণ্য হয়ে যাবে।

গণতন্ত্রের আবর্তে বসবাসকারীরা দাবি করে, তারা যদি এই গণতন্ত্রকে পরিহার করে এবং তাতে অংশগ্রহণ না করে, তবে রাজনীতির অঙ্গন লোকশূণ্য হয়ে শত্রুদের পক্ষে চলে যাবে।

তাদেরকে আমরা বলতে চাই, আপনারা যখন মানুষকে তাওহীদ শিক্ষা দেবেন, তাদেরকে তাওহীদের অনুশীলন করাবেন, তাদের অন্তরে জাহেলী বিধিবিধানের প্রতি ঘৃণার বীজ বপন করবেন, তখন কিছুতেই বিশৃঙ্খলাকারী ইসলামের শত্রুদের পক্ষে মাঠ চলে যাবে না। কারণ আপনারা তো তাদেরকে কোণঠাসা করে ফেলেছেন, তাদের পথ চলার পাথেয় শিরকী মতবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

আপনারা যখন জাহেলী ব্যবস্থাকে বর্জন করবেন,মানুষকে এই জাহিলি ব্যবস্থা বর্জনের দিকে এবং এই ব্যবস্থার কাছে নতি স্বীকার না করার প্রতি আহ্বান করবেন, তখন কিছুতেই তাদের জন্য মাঠ ফাঁকা রেখে চলে আসা হবে না, বরং তাা হবে আপনাদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর আরোপিত অবরোধ ও বয়কট।

পক্ষান্তরে পার্লামেন্টে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সঙ্গে প্রবেশ ক্ষতি বৈ কোন লাভ বয়ে আনে না। উল্টো এতে করে দুষ্ট চক্র বিভিন্ন ফায়দা লুটে নেয়। উদাহরণস্বরূপ,তারা নিজেদের দাবির পক্ষে এই যুক্তি দাঁড় করাতে পারে যে, গণতান্ত্রিক সিস্টেমে কোন সমস্যা নেই। কারণ আলেমগণ এবং দ্বীনের দায়ীগণ এতে অংশ নিয়েছেন।

একইভাবে দ্বীনের দায়ীগণ তাদের অপকর্মের ব্যাপারে চুপ থাকার কারণে তারা লাভবান হয়। চুপ না থেকেই বা উপায় কি? দায়ীরা নিজেরাই তো এসবে অংশগ্রহণ করেছেন।

তারা দিনের দায়ীদেরকে জাহিলি ব্যবস্থাপনা ও ভ্রান্ত মতাদর্শের সামনে নতি স্বীকার করাতে পারায় লাভবান হয়ে যায়। অথচ কথা ছিল, আল্লাহর দ্বীনের দা'য়ীরা তাদেরকে শরীয়তের অনুগামী হতে বাধ্য করবে।
তারা আল্লাহর দ্বীনের দায়ীদেরকে কাল্পনিক কিছু স্বার্থ ও ফায়দা লাভের অজুহাতে শরীয়তের অকাট্য প্রমাণাদির বিরোধিতা করতে বাধ্য করে।অথচ একসময় এই বিকৃত ভ্রান্ত পন্থা অনুসরণ কেবল তাদের নিজেদের মাঝে পাওয়া যেত।

তারা ইসলামপন্থী ও সেক্যুলারদের মধ্যকার পার্থক্য রেখা মুছে দিয়ে ইসলামপন্থীদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বিলীন করতে পারায় লাভবান হয়ে ওঠে। এটা সম্ভব হয় কারণ, ইসলামপন্থী ও সেক্যুলার গোষ্ঠী সকলেই তো এক গম্বুজের নিচেই বসবাস করে এবং বাহ্যিকভাবে হলেও অভিন্ন মতাদর্শ সামনে রেখেই সকলে পথ চলে। তারা সকলেই একই ব্যবস্থাপনার অধীনে থেকে কাজ করে।

নিশ্চয়ই মানুষকে বিচার করতে হয় তার বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা, সে বাহ্যিক অবস্থা বিচারে তারা তো সমান আর ভিতরগত অবস্থার বিচার, সেতো আল্লাহতে ন্যস্ত।

নিশ্চয়ই শিরকী পার্লামেন্টে প্রবেশ করা ইসলামবিরোধী অসাধু চক্রের সবচেয়ে জঘন্য অপরাধগুলোর একটি। এখন যদি আপনারা তাদের এই অপরাধ সংশোধন করতে চান, তাহলে কিছুতেই শিরকী ওই পার্লামেন্টে তাদের সঙ্গে প্রবেশ করা যাবে না। বরং তাদের থেকে এবং তাদের অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকলে তবেই তাদের অপরাধকে অপরাধ বলে ঘোষণা করা যাবে।

এখন যদি কেউ এই অসাধু চক্রের সঙ্গে পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করে, তবে সেও ওই দুষ্ট চক্রের সদস্য। সে কিছুতেই সংশোধনকারী নয়।আহলে ইলমের কাছে এই মূলনীতি স্বতঃসিদ্ধ যে,অন্যায় কাজ সমপর্যায়ের অন্যায় কাজ দ্বারা কিংবা তার চেয়েও জঘন্য অন্যায় কাজ দ্বারা দূরীভূত হয় না।এখন যদি আপনারা আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করার অন্যায় সংশোধন করতে চান শিরকি পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, তবে এতে করে আপনাদেরও তো আল্লাহর কাছে বিচার না চেয়ে জনগণের কাছে বিচার চাওয়া হয়ে গেল।আপনাদেরও তো কোরআন অনুসরণ না করে মানব রচিত সংবিধান অনুসরণ করা হয়ে গেল।
উপরের মূলনীতির বিচারে আমরা বলতে চাই, আপনাদের উক্ত কাজ অন্যায়কে সমপর্যায়ের অন্যায় দ্বারা প্রতিহত করা হয়েছে। এই দুই অন্যায়ের মধ্য থেকে একটির সাহায্যে অন্যটিকে প্রতিহত করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

একইভাবে এইসকল পার্লামেন্টে আপনাদের অংশগ্রহণের কারণ যদি এই হয় যে, দুষ্ট অসাধুচক্র অন্যায়, অত্যাচার, পাপাচার ইত্যাদি যেসকল কুকর্ম করে চলেছে, সেসবের সংশোধন করবেন; তখন আপনাদের এই কাজ হয়ে দাঁড়াবে তাওহীদকে ত্রুটিযুক্ত করার মাধ্যমে কিছু অন্যায় অসৎ কাজের সংশোধন। উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী আপনাদের এমন কাজ হল অন্যায়কে তদাপেক্ষা জঘন্য পর্যায়ের অন্যায়ের দ্বারা প্রতিহত করা। অর্থাৎ অন্যায়কে কমিয়ে আনার পরিবর্তে তা আরও বৃদ্ধি করা।
এখানে একটি আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করা হয় -

ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون

তোমরা ফটক দিয়ে প্রবেশ করে তাদের মুখোমুখি হও। যখন তোমরা প্রবেশ করবে, তখন নিশ্চয়ই জয় তোমাদেরই হবে।

উলামায়ে কেরাম উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল-ভরসা ও জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে দলিল পেশ করে থাকেন। অন্যায় কাজ করার পক্ষে উক্ত আয়াত দলিল নয়। আর আল্লাহর আয়াত দ্বারা এভাবে দলিল পেশ করা আল্লাহর কিতাব নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করার নামান্তর।

আল্লামা আহমদ আলওয়ানশারিসী (রহ.)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় (মি'ইয়ার নামক কিতাবের বর্ণনা), জিম্মি গরিব মুসলমানদের পক্ষে এবং তার সঙ্গে আরও যারা পশ্চিম স্পেনে বসবাস করে, তাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য সে তাদের মুখপাত্রের ভূমিকায় কাজ করে। খ্রিস্টান শাসকদের সঙ্গে তাদের পক্ষ হয়ে কথা বলে। তাদের উপর আপতিত হতে যাওয়া যুগের নানা দুর্যোগ-দুর্বিপাকে তাদের পক্ষে বিবাদ করে। এতে করে তাদের অনেক বড় বড় সংকটের সমাধানও সে করতে সক্ষম হয়। অথচ সে গরীব মুসলমানদের অধিকাংশই এসকল কাজ করতে সক্ষম নয়। এমনকি উপরোক্ত ব্যক্তি যদি খ্রিস্টান ভূমি থেকে হিজরত করে চলে যায়, তাহলে মুসলমানরা তার বদলে অন্য কাউকেই এ কাজের জন্য খুঁজে পাবে না। আর এভাবেই তার অনুপস্থিতিতে তাদের ওপর মহামুসিবত এসে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হবে। এই অবস্থায় কি উক্ত ব্যক্তির জন্য হিজরতের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাফের রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে কাফেরদের সঙ্গে বসবাস করা বৈধ হবে? যেহেতু কাফেরদের সঙ্গে তার এই সহাবস্থানের সঙ্গে বিরাট একশ্রেণীর গরিব মুসলমানের স্বার্থ জড়িত??

তখন তিনি জবাবে বলেন—

“আল্লাহ তাআলার প্রশংসা দিয়ে জবাব লেখা আরম্ভ করছি। তিনি মহান। আর তাঁর অনুগ্রহ ও তৌফিকই আমার সম্বল।

আমাদের পরাক্রমশালী অদ্বিতীয় ইলাহ্ অভিশপ্ত কাফের গোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা, তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন হাতকড়া ও শেকল, যা নিয়ে তারা দেশ-দেশান্তরে ঘুরে ফিরবে, শহরে নগরে লাঞ্ছনার বোঝা বয়ে বেড়াবে। এতে ইসলামের মর্যাদা ও প্রিয় নবীর সম্মান প্রকাশ পাবে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন এবং সম্মান দান করুন-তাদের কেউ যদি কাফেরদের গলার শেকল ও হাতের বেড়ি নিজের জন্য পছন্দ করে নেয়,তবে সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিল। এতে সে ক্ষমতাধর প্রতাপশালী আল্লাহর ক্রোধে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করল। এই অবস্থায় কাফেরদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা যদি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন, তাহলে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز

আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন,নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয় লাভ করবো, নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর পরাক্রমশালী।

তাই আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এমন প্রতিটি মুসলমানের জন্য কর্তব্য হল, আল্লাহর হাবীবের দুশমনদের সঙ্গে সহাবস্থান থেকে নিজেকে দূরত্বে রেখে দুনিয়া-আখেরাতের মূলধন ঈমানের হেফাজত করা।আর তাগুত শাসকদল এবং মুসলিম জিম্মিদের মাঝে দোভাষীর ভূমিকা

পালনের অজুহাতে উক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির কাফের রাষ্ট্রে বসবাস ওয়াজিব হিজরতের দায়িত্ব থেকে তাকে মুক্তি দেবে না। কারণ অপদস্থতার সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম ব্যতীত অন্যান্য কাফেরদের সঙ্গে সহাবস্থান এক মুহূর্তের জন্যও জায়েজ ও বৈধ নয়। কারণ এতে জীবনভর দুনিয়া আখেরাতের অসংখ্য ক্ষতির কারণ ও অপবিত্রতা বয়ে বেড়াতে হয়। তন্মধ্যে একটি- এই শরীয়তের দাবি হলো, ইসলামের কালিমাখচিত এবং সত্যের সাক্ষ্যদানসূচক পতাকা সর্বদা অন্য সবকিছু অপেক্ষা সমুন্নত ও উচ্চ অবস্থানে থাকবে। যেখানেই পঙ্কিলতা,যেখানেই কুফরের দৌরাত্ম্যের উদ্ধত প্রকাশ, ইসলামের বিজয় নিশান সে স্থান থেকে থাকবে শত ক্রোশ দূরে।

আর কাফেরদের অধীনে লাঞ্ছনা অপদস্থতার সঙ্গে মুসলমানদের বসবাসের দ্বারা ইসলামের সুমহান সুউচ্চ পতাকার অমর্যাদা হয়ে যায়, তা আর সুউচ্চ অবস্থানে থাকে না। তা লাঞ্ছিত হয়ে যায়, সম্মানের আসনে থাকেনা। শরীয়তের নীতিমালা ও উসূলের এতোটুকু বিরোধিতাই তো এমন সহাবস্থান অবৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।”

পাঠক! শায়েখের এ উক্তি লক্ষ্য করুন- “শরীয়তের দাবি ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'কালিমাতুল ইসলাম' এবং 'শাহাদাতুল হক' অন্য সবকিছু থেকে উপরে থাকবে। সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র থাকবে। কুফরের নিদর্শনাবলী ও পতাকা তার উপর উঠে যাওয়া থেকে দূরত্বে থাকবে।”

এবার আপনারাই বলুন, এসকল পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ 'কালিমাতুল ইসলাম'কে অন্য সবকিছুর উপরে স্থান দেয় এবং কুফরের নিদর্শনাবলী প্রকাশ পাওয়া থেকে দূরত্বে অবস্থানের সুযোগ রাখে?? নাকি এসকল পার্লামেন্টে জনগণের নামে বিধান প্রণীত হয় এবং সর্বপ্রকার ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় আইন ও সংবিধানের জন্য নির্ধারিত থাকে??

অতএব আল্লাহর দ্বীনের নামে এসকল পার্লামেন্টে প্রবেশ করা আল্লাহর শরীয়তকে অপদস্থ করা ও শরীয়তকে সেই কুফরি সংবিধানের অনুগামী বানানোর মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শনের নামান্তর। কাজগুলো অন্যায় হবার জন্য তো এতোটুকুই যথেষ্ট।

যারা এ সকল পার্লামেন্টে প্রবেশ করে, তারা নিজেদেরকে গণতন্ত্রের বিরোধী ও শত্রু হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাতে প্রবেশ করে না। বরং নিজেদেরকে অংশীদার ও মিত্র পরিচয় দিয়ে তাতে প্রবেশ করে।

ঐসকল পার্লামেন্টে যখন তাদের সই সহকারে মানব রচিত বিধান ও শিরকী আইন পাস হয়, তখন তারা না তাতে বাধা দিতে পারে আর না তার প্রতিবাদ করতে পারে!!

إن السلامة من سلمى وجارتها ... إلا تمر بواد قرب واديها

[নিশ্চয়ই সালমা এবং তার প্রতিবেশিনীদেরকে এড়িয়ে চলা তখনই সম্ভব হবে, যখন তাদের গৃহের আশপাশের গৃহগুলোকেও তুমি এড়িয়ে চলবে।]

আল্লাহ তাআলা সুফিয়ান সাওরীর প্রতি অনুগ্রহ করুন! তিনি শাসকদের চাটুকারিতার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে তার কোন এক শিষ্যকে বলেন:-

শাসকবর্গ থেকে সাবধান! যেকোনো বিষয়ে তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া থেকে সাবধান!! আর এই আত্মপ্রবঞ্চনা থেকেও সাবধান যে, তুমি কোন মজলুমের পক্ষে সুপারিশ করার জন্য অথবা অধিকারহারা মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য শাসকদের কাছে ভিড়তে চাচ্ছো! কারণ এমন ভাবনা ইবলিশের প্ররোচনা, পাপিষ্ঠ আলেমরা যার সাহায্যে নিজেদের পক্ষে সাফাই গেয়ে থাকে।

"আলইক্বদুল ফারিদ" নামক গ্রন্থে একটি বর্ণনা এসেছে:

মালিক ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার খলিফা আবু জাফর মনসুর আমাকে এবং ইবনে তাউসকে দূত মারফত ডেকে পাঠালেন। আমরা তার কাছে গিয়ে তার দরবারে প্রবেশ করলাম। দেখতে পেলাম তিনি অত্যন্ত পরিপাটি একটি ফরাশে উপবিষ্ট। তার সম্মুখে চাদর বিছানা। কাছে কোতোয়াল বাহিনী তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তারা গর্দান ফেলে দিতে প্রস্তুত। খলিফা আমাদের দুজনকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। আমরা বসে পড়লাম। খলীফা বললেন: হে ইবনে তাউস! আমাকে এই কলমটিতে দোয়াত ভরে দিন। কিন্তু ইবনে তাউস এ নির্দেশ পালন করা থেকে বিরত থাকলেন। তখন খলীফা বললেন: আমার নির্দেশ পালন করে কলমটিতে আপনি কেন দোয়াত ভরে দিলেন না?

উত্তরে ইবনে তাউস বললেন: আমার ভয় হয়,আপনি তা দিয়ে আল্লাহর কোন গুনাহের কথা লিখবেন আর আমি তাতে এ কাজে আপনার অংশীদার হয়ে যাব! খলিফা তখন তার এই কথা শুনে বললেন, আপনারা দুজন আমার কাছ থেকে চলে যান। ইবনে তাওস বললেন: আজ পর্যন্ত আমরা আপনার এমন আদেশেরই অপেক্ষায় ছিলাম।

ইমাম মালেক বলেন: এ ঘটনার পর আমি ইবনে তাউসকে সমীহ করে চলতাম।

সাইয়েদ কুতুব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“আমরা আগেও বলেছি, ইসলাম নিছক তত্ত্বে বিমূর্ত কোন মতবাদ নয়, যা তার অনুসারীদের কিছু বিশ্বাস এবং দৈনন্দিন পালনীয় অল্প কিছু ইবাদতের অনুশীলনের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকবে। আর তারপর তার অনুসারীরা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গ সংগঠনের সদস্য হয়ে প্রচলিত সামাজিকতা অনুসরণ করে চলতে থাকবে। কারণ এইভাবে তাদের উপস্থিতি

সংখ্যায় তারা যতই হোক না কেন ইসলামের প্রকৃত ও সত্যিকারের বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠায় কোন প্রকার ভূমিকা রাখে না। কারণ জাহেলি সমাজব্যবস্থার অনুগামী নিছক তত্ত্বকথায় আবদ্ধ এই ইসলামপন্থা এই সমাজের সদস্যতার অনিবার্য দাবি পূরণে বাধ্য।

তারা ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, সচেতনভাবে হোক কিংবা অসচেতনভাবে এই সমাজে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জীবনের প্রাথমিক চাহিদা পূরণার্থে এই সামাজিক কাঠামো ধরে রাখার এবং সমাজের অস্তিত্বের জন্য হুমকি এমন সকল উপকরণ প্রতিহত করার সংগ্রামে জড়িয়ে পড়বে। কারণ একটি সমাজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তার সকল অঙ্গ ও শাখাকেই এসকল কার্যকলাপে অংশ নিতে বাধ্য করবে, চাই সকলের ইচ্ছা থাকুক কিংবা না থাকুক। ফলাফল এই দাঁড়াবে, দৃষ্টিভঙ্গি ও তত্ত্বের বিচারে মুসলিম যে জনগোষ্ঠীটি নিজেদের তাত্ত্বিক ধর্মীয় পর্যালোচনায় জাহিলী সমাজব্যবস্থার পতনের কথা বলবে, বাস্তবে তারাই সেই জাহেলী সমাজ কাঠামো শক্তিশালীকরণে অংশ নেবে। এতে করে তারা বিরাট এক দানবীয় দেহের এমন অঙ্গ ও কোষে পরিণত হবে, যে দানবটা প্রতিনিয়ত জাহিলি এই সমাজকে প্রটেকশন দিয়ে যাচ্ছে এবং সমাজটির অস্তিত্ব রক্ষার সকল উপকরণ সরবরাহ করে যাচ্ছে। মুসলিম জনসাধারণই আজ নিজেদের সামর্থ্য, মেধা, শ্রম ব্যয় করে জাহেলী এই সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে। ফলে দিন দিন এর ভিত আরও মজবুত হচ্ছে। একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাহেলী এই সমাজ ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার দিকে নিজেদের আন্দোলনের গতিমুখ না ফেরানোতে এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। (মা'আলিম ফিত-ত্বারিক)

আমাদের জেনে রাখা চাই, ইসলামবিরোধী অসাধু চক্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তাদেরকে বর্জন করা এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার মাধ্যমেই আমাদের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার সামনে এবং তার বান্দাদের সামনে এদের কর্মকাণ্ড থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করা সম্ভবপর হবে।

এই প্রক্রিয়াতেই তাদের মুখোশ খুলে ফেলা যাবে এবং মানুষের সামনে তাদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা সম্ভব হবে। কারণ মানুষ তখন জানতে পারবে, এ সকল সংসদ ও বিধানসভা শিরক এবং মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। তখন মানুষ আর এগুলোর ডাকে সাড়া দেবে না। এতে করেই অসাধুচক্রকে মানুষের সামনে একথা বলতে বাধ্য করা যাবে যে, তাদের কর্মকাণ্ড এবং আইন কানুনের কোন বৈধতা নেই।

পরিস্থিতি তখন এমন হবে, অসাধু এই চক্রটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্য এবং নিজেদের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর দ্বীনের লেবাস নিজেদের গায়ে জড়াতে বাধ্য হবে। আর তখনই আল্লাহর শরীয়ত বিরোধী আইন পাশ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

শায়খ মুহাম্মদ কুতুব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

"ইসলামের শত্রুদের রাজনৈতিক সংগঠনের অঙ্গ ইসলামী দলগুলি কূটনীতির খেলায় পরাজিত আর শত্রুরাই এক্ষেত্রে বিজয়ী। শত্রুদের এই বিজয় বিভিন্নভাবে হতে পারে। তাদের এ বিজয় এই প্রক্রিয়ায় হয় যে, হয়তো তারা যেকোন একটা ইস্যুতে ইসলামী দলগুলোকে নিজেদের অংশীদার করে অথবা তাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে কিংবা উক্ত ইস্যুতে তাদের নিজেদের সঙ্গে ইসলামী দলগুলোর সাহায্য সহযোগিতার বিষয়টি জনসাধারণকে দেখিয়ে তাদের সুনাম নষ্ট করে। অথবা জনসাধারণের চোখে ইসলামী এই দলগুলোর স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা মুছে দিয়ে তাদেরকে অপূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ করে।

একটি সমাজ বিপ্লবের জন্য বিপ্লবী শক্তিকে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা নিয়ে সমাজের লোকদের মাঝে উপস্থিত হতে হয়। ইসলামী বিপ্লবের বেলায় এক্ষেত্রে বিপ্লবী শক্তিকে আশপাশের জাহিলি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হয়। যাতে সমাজের মানুষের মনে তাদের সম্পর্কে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তারাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট। আর অন্য সকল বস্তুবাদী রাজনৈতিক সংগঠন কেবল জাগতিক উন্নতি ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত, জাহেলিয়াত ও মূর্খতার অন্ধকার গহ্বরে হাবুডুবু খেতে খেতে আল্লাহর শরীয়ত থেকে বিমুখ হতে যাদের এক মুহূর্ত চিন্তা করতে হয় না। (ওয়াক্বি'উনাল মু'আসির)

৫ নং সংশয়: ভিশন ইসলাম

গণতান্ত্রিক সিস্টেমের ফাঁদে পড়া একদল লোকে বলে, এই সিস্টেমে অংশগ্রহণে কোন অসুবিধা নেই, কারণ আখের আমরা ইসলামকেই তো প্রতিষ্ঠা করবো।
তারা এই স্লোগান দেয়, "ইসলাম মোদের ভিশন, গণতন্ত্র মোদের মিশন"

কি আশ্চর্য! তারা পরস্পর বিপরীত দুটো বিষয়কে কি অসম্ভব চাতুরতায় এক করে ফেলল! তাদের পক্ষে কীরূপে সম্ভব হলো ইসলাম ও গণতন্ত্রকে এক করে ফেলা,অথচ ইসলামে সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ আর গণতন্ত্রে সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র জনগণ!!

তারা কি বুঝতে পারছে না যে, "গণতন্ত্র আমাদের মিশন" তাদের এই উক্তি "ইসলাম আমাদের ভিশন" মর্মে তাদের দাবিকে মিথ্যা প্রমাণিত করছে?! যে ব্যক্তি গণতন্ত্রের কথা বলে, জোর করে গণতন্ত্রকে ইসলামের সঙ্গে মেলাতে চায় এবং গণতন্ত্রের পক্ষে বিবাদ করে, কিভাবে তার ভিশন ইসলাম হতে পারে?! যে ব্যক্তি সকল কিছুতে ক্ষমতার উৎস হিসেবে জনগণকে মেনে নেয়, কিভাবে তার ভিশন ইসলাম হতে পারে?! যে ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়, কিভাবে তার ভিশন ইসলাম হতে পারে?! যে ব্যক্তি ধর্মত্যাগীদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে দেশ শাসন করতে চায়, কিভাবে তার ভিশন

ইসলাম হতে পারে?! যে ব্যক্তি মানব রচিত সংবিধানের কাছে বিচার কামনা করে, কিভাবে তার ভিশন ইসলাম হতে পারে? তোমার রয়েছে সহস্র উপাস্য, আদেশ তুমি মানছো যাদের ছেড়েছ এক ইলাহকে, করছো দাবি তাওহিদের।

এ সকল লোকদের উক্ত স্লোগান জাহিলিয়াতে কুরাইশদের এই তালবিয়া ধ্বনির মতো -"লাব্বাইক হে আল্লাহ! আপনার কোন শরিক নেই একজন ব্যতীত, যিনি আপনারই অধীনস্থ, আপনি তার অধীনস্থ নন।"

এই তালবিয়া বাক্যে কুরাইশরা প্রথমে আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে তারপর শিরকের ঘোষণা দিচ্ছে। একইভাবে বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরাও প্রথমে ইসলামের ঘোষণা দিয়ে দ্বিতীয়তে ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিচ্ছে!!

"ভিশন ইসলাম" এ কথার অর্থ কি আমাদের জানা আছে? এ কথার অর্থ হল ছোট-বড় সকল বিষয়ে কিতাব এবং সুন্নাহের দিকে আমরা ফিরে যাবো। কোন কাজই করব না, যতক্ষণ তাতে আল্লাহর নির্দেশ কি তা না জানবো, অতঃপর আল্লাহর সেই নির্দেশের সামনে মাথা নত করার জন্য সর্বাত্মকভাবে আন্তরিক না হবো। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:-

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

আর না...তারা কিছুতেই ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না নিজেদের মাঝে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তারা আপনাকে বিচারক বানায় অতঃপর আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনরূপ সংশয় ও দ্বিধা না রাখে এবং যতক্ষণ না পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে।

রাজনৈতিক এ সকল দলের ব্যাপারে কথা হল, তাদের ভিশন ইসলাম এ কথার অর্থ এই নয় যে, তারা কেবল মসজিদে নামাজ আদায় এবং রমজানে রোজার পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতি দেবে আর মুসলিম দাবিদার অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলো এর উপর ভিত্তি করে তাদের সঙ্গে শরিক হয়ে যাবে।

বরং এ কথার অর্থ হল, তারা একটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে এবং তার অধীনে আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়ন করবে এবং অন্য সকল ব্যবস্থা, ইসলামবিরোধী অন্য সকল মত ও পন্থা বিলুপ্ত করবে।

এখন যে ব্যক্তি চাচ্ছেই অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থার অংশীদার হতে সে কিভাবে দাবি করে যে, তার লক্ষ্য ইসলাম বাস্তবায়ন করা??

অতএব এসকল দলগুলোর ইসলামের দাবী কখনোই ধোপে টিকবে না যতক্ষণ না তাদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম, কর্মসূচি, নির্বাচনী ইশতেহার থেকে একথা স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, ইসলামী দণ্ডবিধির প্রচলন ঘটাবে এবং আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার এর প্রতিষ্ঠা করবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور

তারা এমন ব্যক্তি, যাদেরকে আমি জমিনে কর্তিত্ব দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বারণ করবে। সকল কিছুর চূড়ান্ত পরিণতি তো আল্লাহরই হাতে।

অতএব আমরা বুঝতে পারলাম, এ সকল দলের ইশতেহারে আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়ন, শরীয়তের দণ্ডবিধির প্রয়োগ এবং সুদ, ব্যভিচারসহ সকল অন্যায় অশ্লীলতার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এবং তার ওপর শাস্তি বিধান জারির প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে। প্রকাশ্যে তাদেরকে এই ঘোষণা দিতে হবে যে,আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন শরীয়ত গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান নেই। কোরআন-ই উম্মতের একমাত্র সংবিধান,অন্য কোন সংবিধান রক্ষার জন্য যার মাঝে ছাড় দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।

আমাদের উচিত এখন নিজেদেরকে প্রশ্ন করা-

গণতান্ত্রিক সিস্টেমে অংশগ্রহণকারী ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক কার্যক্রম ও ইশতেহারের মাঝে এবং অন্যান্য দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম ও ইশতেহারের মাঝে যখন কোনই পার্থক্য নেই, তখন এই ইসলামী দলগুলোকে কোন সূত্রে সেক্যুলার ও ধর্মনিরপেক্ষ দল থেকে আলাদা ও পৃথক মনে করা হচ্ছে?

"ভিশন ইসলাম" -এ স্লোগানের কি মূল্য থাকতে পারে যখন রাজনৈতিক কার্যক্রমে এর কোনো প্রভাব নেই?

ইসলামের পতাকা বহন করে গণতান্ত্রিক সিস্টেমে অংশগ্রহণকারী এসকল দলের অবস্থা সে সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মত, যেগুলো নামের শুরুতে ইসলাম যোগ করে আর একই সময়ে সুদে ব্যবসা করে।

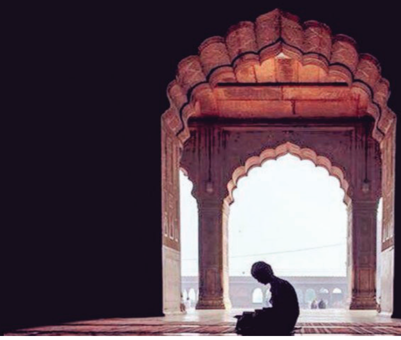
অনুবাদ: মুহাম্মাদ সালমান রুমী

পর্ব- ২ সমাপ্ত।

চলবে...

প্রথম পর্ব

উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. এর সাথে কিছুক্ষণ



মুঈনুদ্দিন শামী

‘নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ’ আগস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যা-২০১৯ থেকে সংগৃহীত এবং অনূদিত

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
সকল প্রশংসা নিঃসন্দেহে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যই, যিনি আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরই আল্লাহ্। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদের মরণ দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি জীবন ও মরণ এজন্যই সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তিনি দেখে নিতে পারেন যে আমাদের মধ্যে থেকে কে উত্তম আমল করে?

নোট: উক্ত আলোচনায় যেখানেই ‘উস্তাদ’ বা ‘উস্তাদজী’ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘শহীদ আলেমে রব্বানী উস্তাদ আহমাদ ফারুক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. এর সাথে কয়েকটি সাক্ষাৎকার। তার থেকে কিছু স্মৃতিচারণ করা। তার কিছু কথা এমন ছিলো যা বিশেষভাবে আমার হৃদয়ে আন্দোলনের ঝড় তুলতো। উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. এর জিবদ্দশায় তার প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে হয়তোবা গণ্য ছিলাম না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট আমি আশাবাদী যে, তার শাহাদাতের পরে তার বন্ধুদের মধ্যে শামিল হয়েছি। আল্লাহর ইচ্ছায়- যদিও তার জিবদ্দশাতেই তার বন্ধুদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলাম। উস্তাদের মহব্বতের উল্লেখ এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইনশা আল্লাহ্ – তিনি আমাদের আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রিয়দের একজন ছিলেন। তিনি আমাদেরও প্রিয় ছিলেন এবং আমিও তার প্রিয় ছিলাম। আর এ ভালোবাসার সোনালী জিঞ্জির যা আল্লাহর দরবারে আলোচিত হওয়ার অন্যতম একটি পন্থা বা কারণ যার মাধ্যমে উস্তাদও আমাদের ভুলবেন না। ইনশা আল্লাহ্!

হযরত উস্তাদ (রহ.) এর সাথে আজ পর্যন্ত যতবার সাক্ষাত হয়েছে তার সকল স্মৃতি ও কথাতো স্মরণে নেই, কিন্তু তার যতটুকু স্মৃতিতে এখনো সজীবতার সাক্ষ্য রেখে চলছে, তার পুরোটুকু কাগজের গায়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করবো। যা পরপারে ঘাটের কড়ি হিসেবে কাজে দিবে- ইংশা আল্লাহ্। আমি সহ যারা হযরত উস্তাদজী (রহ.) কে ভালোবাসেন তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের ফায়দা হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে সঠিক কথা, সঠিক নিয়্যতে ও সঠিক পন্থায় ব্যক্তকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেন।

শুরুতেই একথা জেনে নেওয়া জরুরী যে, এই আলোচনার লেখক উস্তাদ (রহ.) এর প্রিয় ব্যক্তিদের একজন। তার শাগরেদদের মধ্যে শেষ সময়ের ছাত্র। এ সকল কথা বার্তা ও চিন্তা-ফিকিরের ঘটনা প্রবাহের প্রত্যক্ষদর্শী আমি নিজেই। এ জন্য আমার উক্ত আলোচনা-পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যদি এমন কোন কথা লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, যা-কিনা উস্তাদের শানের খেলাপ, সেগুলো আমারই ভুল হিসেবে ধরে নিতে হবে এবং সে ভুল থেকে অবশ্যই ফিরে থাকতে হবে।

লেখক এক নীরব চোরাবালির মধ্যে পাথরের অবস্থানের মতোই আলোচনাটিকে শুরু করেছেন। তিনি অপরিণাম চিন্তাভাবনা ও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা আরম্ভ করেন। তা-না হলে পাঠকদের অধিকার, ইতিহাসের অধিকার ও উস্তাদের হক্বতো এটা ছিলো যে, এ বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তারাই কলম ধরবেন। এ লেখাটি আসলে ঐ সকল লোকদের জন্য যাদের মনমানসিকতা শুধু পাঠের জন্য প্রস্তুত। আল্লাহ্ তা'য়ালা মন্দ কথা থেকে আমাকে দূরে রাখুন এবং আমার স্মৃতি ও কলমকে সঠিক রাস্তায় ব্যবহার করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

রণাঙ্গন হলো আত্মশুদ্ধির এক অব্যর্থ ময়দান

উস্তাদজী (রহ.) এক দরসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান ও ইজ্জতের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। উক্ত দরসের পরে উস্তাদজী নিজের বাসায় ফিরে যান। বাসায় যাওয়ার সময় আমি বললাম, “হযরত! রণাঙ্গন সম্পর্কে দুনিয়াবাসীকে জানানো উচিৎ”।

এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে উস্তাদজী (রহ.) বলেন, “অবশ্যই জানানো উচিৎ। এটা অন্তরের চিন্তা-ভাবনার দিককে ঘোরানোর জন্য খুবই জরুরী। সত্য কথা হলো, রণাঙ্গনে যাওয়া এবং রণাঙ্গনে অতিবাহিত প্রতিটি মূহুর্ত বাস্তবে মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে। কেননা, রণাঙ্গনে থেকে থেকে তোপের আওয়াজের কারণে সবসময় মৃত্যুর চিন্তা অন্তরে থাকে। না-জানি কখন কোন ট্যাংকের আক্রমণ, মিসাইলের আঘাত কিংবা গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্তর

ও কলিজা ছিঁড়ে যায়। কখন জানি মৃত্যু চলে আসে। এমন চিন্তা সবসময় মাথায় ঘুরতে থাকে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে দুনিয়া ও দুনিয়ার সামান্য ভোগ বিলাস আর ক্ষণস্থায়ী নাম-যশের হাজারো চিন্তাভাবনা তখন তাকে আর বিচলিত করতে পারে না। উস্তাদজী (রহ.) এর উত্তর শেষ হলে বললেন যে, 'আমাদের অবস্থা হলো আমরা আঙ্গুরের থেকে ছাল তোলা নিয়ে ব্যস্ত। তাই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বব্যাপী চলমান কাজ থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেছি।"

একথাগুলো বলার পর উস্তাদজী (রহ.) চলে গেলেন এবং সম্ভবত তিন মাস পর পুনরায় সাক্ষাৎ ও সাথে থাকার সুযোগ পাই। এব্যাপারে উস্তাদের একটি কথা স্মরণে আসলো তাই বলছি। উস্তাদজী (রহ.) বলেন: "শায়খ আবু ওয়ালীদ আল-আনসারী (ফিলিস্তিনী) মসজিদে হারামে বায়তুল্লাহর ছায়ায় দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষার কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। তিনি একবার বলছিলেন, ইলমের যে বরকতের বৃষ্টি জিহাদের ময়দানে বর্ষিত হয় তার কোন তুলনা নেই।

শায়খ আবু দুজানা পাশা - যার একটি পা জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে যাওয়ার পরও জিহাদের ময়দানেই ছিলেন। কারণ যে রহমত ও বরকত এখানে (জিহাদের ময়দানে) বর্ষিত হয়, তা আর কোথাও হয় না। সুতরাং এ ময়দানে যে পরিমাণ ফুয়ুজ ও মারেফাত (আল্লাহর সান্নিধ্য) অর্জিত হয় তা অন্য কোনো স্থানের সাথে তুলনায় হয় না।

মুহাজির কখনো অকৃতজ্ঞ হয় না

আমরা একবার আবু ইউসুফ ভাইয়ের অতিথি হয়েছিলাম। তার ব্যাপারে কিছু কথা বলা খুবই জরুরী। কিন্তু তার পূর্বে আমাদের একজন আনসারী ভাইয়ের আলোচনা করাটা জরুরী। আমরা এখানে যে আনসারী ভাইকে সবসময় সাথে পেয়েছি, তার এক ভাই একদিন আমাকে বললেন যে, 'তুমি এখান থেকে চলে যাবে! আর কখনো আমাদের অবস্থাও জানতে চাইবে না! তারপর বললেন যে, 'মুহাজির অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে!'

আমি যেহেতু জিহাদের ময়দানে নতুন তাই উক্ত কথার কোন সদুত্তর আমার নিজেরও জানা ছিলো না। বরং উক্ত আনসার ভাইয়ের ঐ কথাই আমি বুঝতে পারিনি। তবে আনসারী ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর হলো - 'মুহাজির কখনো অকৃতজ্ঞ হয় না বরং সে অক্ষম হয়ে থাকে। মুহাজিরের না থাকে কোনো ঘর, আর না থাকে কোনো আসবাবপত্র বা যোগাযোগ রক্ষা করার মতো কোনো মাধ্যম কিংবা রাস্তা। অনেক সময় মুহাজির এমন অবস্থায় আনসারীর থেকে বিদায় নেয়, যার বর্ণনা করা অসম্ভব। মুহাজিররা অকৃতজ্ঞ না। তারা আনসার ভাইকে স্মরণে রাখে। তার জন্য দু'য়া করতে থাকে।

আনসারী 'দাদক' ভাইয়ের সাথে উস্তাদজী (রহ.) এর সম্পর্ক

সুবহানাল্লাহ্! পূর্বের সংখ্যায় একটি ঘটনা বলতে চেয়ে ভুলে গিয়েছিলাম। যা এই আনসারী ভাইয়ের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেলো।

আমরা যখন মুসয়াব (রহ.) ভাইয়ের আতিথেয়তায় ছিলাম সেই দিনের ঘটনা – 'জিহাদি আনসারী ভাই' যাকে ঐ এলাকার সকলে 'দাদক' বলে ডাকতো, সেই আনসারী ভাইয়ের শাহাদাতের খবর পেলাম। দাদক (রহ.) এর সাথে শায়খ আহসান আজিজ (রহ.) এর নুসরত ও হিজরতের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। দাদক (রহ.) ছিলেন তার এলাকার কোনো এক মন্ত্রীর লোক। তিনি খুবই ভালো ও ভদ্র মানুষ ছিলেন। তিনি শত্রু-মিত্র সকলের কাছেই সম্মানের পাত্র ছিলেন।

উস্তাদজী (রহ.) এর সাথে দাদক (রহ.) এর কেমন সম্পর্ক এবং কী প্রকারের ছিলো সেব্যাপারে আমি বেশি কিছু জানিনা। দাদক (রহ.) এর সাথে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয় নি। দাদক (রহ.) এর শাহাদাতের ঘটনা থেকে উস্তাদজী (রহ.) এর সাথে তাঁর সম্পর্কের একটা ধারণা পাওয়া যায়।

দাদক (রহ.) এর শাহাদাত

উস্তাদজী (রহ.), দাদক (রহ.) এর শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন। দু:খ ও পেরেশানিতে উস্তাদজী (রহ.) এর চক্ষুদ্বয় রক্তিম হয়ে যায়। সাথে সাথে তিনি আমাদের মারকাযে চলে আসেন এবং ঐ অবস্থায়ই তিনি দাদক (রহ.) এর শাহাদাতের খবর আমাদের জানালেন।

কিছুক্ষণ পর উস্তাদজী (রহ.) দাদক (রহ.) এর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। সেখান থেকে তিনি সম্ভবত একদিন বাদে ফিরে এসেছিলেন। তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন এবং বার বার দাদক (রহ.) এর নাম বলছিলেন। এসময় উস্তাদজী (রহ.) অভ্যাস অনুযায়ী মাথা নিচু করে জমিনের উপর দৃষ্টি রেখে অশ্রু প্রবাহিত করছিলেন।

দাদক (রহ.) কে পাকিস্তানী (মুরতাদ) সৈন্যরা জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য (ধোঁকা দিয়ে) কোহাত সিটির এক ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে যায়। তার সাথে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের এক মুজাহিদ কমান্ডার 'সামিউল্লাহ কান্দাহারী' সাহেবও ছিলেন। আর শায়খ আহসান আজিজ (রহ.) এর সাথে সামিউল্লাহ্ কান্দাহারী ভাইয়ের দৃঢ় সম্পর্ক ছিলো।

হিতিনের অ্যান্ডরু ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'সরেজমিনে খোরাসানের তাজা দাস্তান' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই অজুহাতে দাদক (রহ.) ও সামিউল্লাহ্ কান্দাহারী ভাইকে ডেকে নিয়ে পাকিস্তানের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী তাদেরকে গুম করে ফেলে। দীর্ঘদিন যাবত তাদেরকে গোপন এক আস্তানায়

বন্দী করে রাখা হয়। আট-নয় মাস পরে জিহাদ ও ইসলামের শত্রুতার প্রতীক - পাকিস্তানী সৈন্যরা উক্ত শায়খদ্বয়কে শহীদ করে দেয় এবং মারওয়াত ক্যাম্পের বাইরে তাদের লাশ ফেলে রাখে। তারপর তাদের লাশ নিয়ে আসা হলে উস্তাদজী (রহ.) ও সেখানে যান।

বাহলুল (রহ.) এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো সত্যকে প্রকাশ করা!

দাদক (রহ.) এর শাহাদাতের পর আমাদের আবু সাঈফ ভাইও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। আবু সাঈফ ভাইয়ের সীমান্ত এলাকার সাথে তেমন কোন সম্পর্ক ছিলো না। তিনি একজন ফাযেলে আলেমে দ্বীন ছিলেন। তার আসল নাম হলো ‘বাহলুল’।

খলিফা হারুন-অর-রশীদের ঘটনার মধ্যে যে বাহলুলের আলোচনা হয়েছে সেই বাহলুলের প্রসিদ্ধ একটি গুণ ছিল - ‘সত্য কথাকে অকপটে বলে ফেলা’। উক্ত বৈশিষ্ট্যটি আবু সাঈফ ভাইয়ের মাঝে খুব বেশি মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। তার নিকট যে বিষয়টি ভুল বা বেঠিক মনে হতো সেটাকে তিনি কোনরূপ গালমন্দের ও ভয়ের তোয়াক্কা না করে বলে দিতেন। যদি কখনো এমন মনে হতো যে, তিনি নিজেই ভুল করেছেন, তাহলে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ছোটদের কাছেও দুঃখ প্রকাশে বিলম্ব করতেন না। আবু সাঈফ ভাই জনাব মাওলানা সাঈদুল্লাহ্ খান (রহ.) এর আত্মীয় ছিলেন। লেখক আবু সাঈফ ভাইকে চাচা বলে ডাকতেন। কারণ, আবু সাঈফ ভাইয়ের বয়সের তুলনায় লেখকের বয়স খুবই কম ছিলো।

চাচা আবু সাঈফ যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন থেকেই জিহাদের ময়দানে দৌড় ঝাপ শুরু করেন। রুশদের বিরুদ্ধে প্রথম আফগান জিহাদ শুরু হলে, তিনি ঐ জিহাদে আল্লাহ্ তা’য়ালার করুণায় অংশগ্রহণ করেন। সেখানকার অনেক ঘটনা আমাদেরকে শুনিয়েছেন।

একবার এক ঘটনা বলেছিলেন এমন - ময়দানে একজন (ট্রেইনার) উস্তাদ ছিলেন যাকে তার এক মুজাহিদ শাগরেদ ‘আবু জালিম’ বলে ডাকতেন। কারণ হলো এই যে, তিনি প্রশিক্ষণের সময় শারীরিক ব্যায়াম ও কসরত সহ সবকিছুতে কঠিনভাবে তরবিয়ত দিতেন/করতেন। চাচা আবু সাঈফ বলেন যে, সেই প্রশিক্ষণ শিবিরে খাবারের মধ্যে সর্বদাই বরবটি/সিমের মধ্যেকার লাল বিচি থাকতো। যার আসল রহস্য ছিলো মাল কম খরচ করা। একদিন এক মুজাহিদ ভাই এক জিম্মাদার সাথীকে জিজ্ঞেস করেন যে, “প্রতিদিন লাল বিচি খাওয়ার কারণটা কী?

ঐ জিম্মাদার সাথী জবাবে বলেন যে, ‘লাল বিচিতে রক্ত তৈরি হয়’! যদিও জবাবটি ঐ সাথী একটু কঠিন ভাবেই দিয়েছেন ‘কেননা যে লাল বিচি দেখতে দেখতেই রক্তে কি পরিমাণ আগুন লেগে যায় তার কি কোনো হিসেব নেই!’ আর উক্ত কথাবার্তার এক পর্যায়ে তার চেহারা জাফরানের মতো রক্তিম হয়ে যায়।

আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান!

চাচা আবু সাঈফকে আমেরিকা এবং তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন উস্তাদজী (রহ.) নিজেই। ইসলামাবাদে চাচা আবু সাঈফের একটি দোকান ছিলো। সে দোকানে উস্তাদজী (রহ.) এর বন্ধুবর মাওলানা সাঈদুল্লাহ্ এর সাথে যাতায়াত করতেন। আর এ যাওয়া আসাটাই চাচাকে জিহাদের দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যম হয়ে দাড়ায়।

অনন্য বৈশিষ্ট্য সংকোচ (তাকাল্লুফী) না করা!

চাচা আবু সাঈফের একটি বড় গুণ ছিলো - কোন বিষয়ে সংকোচ না করা। একদিন আমি ফায়যান ভাইয়ের সাথে সুহাইল (রহ.) ভাইয়ের বাসায় যাই। আবু সাঈফ চাচা আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। আমরা যখন উপস্থিত হই তখন তিনি বৈঠকখানায় বসে খানা খাচ্ছিলেন। আবু সাঈফ চাচা আমাকে দেখে তার সাথে খানায় শরীক হতে বললেন।

খানা কম থাকায় আমি এমন একটা অজুহাত দেখালাম, যাতে করে আবু সাঈফ চাচা বুঝলেন যে, আমি খানা খেয়েছি অথবা খাবারের চাহিদা এখন নেই। যদিও সেসময় আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। ফায়যান ভাই আসার পরে সুহাইল ভাই জানালেন যে, আমার জন্যও খানা এনেছেন। কিন্তু এর আগেই আমি খাবো না বলে ফেলেছি। একথা শোনার পর চাচা আবু সাঈফ রাগ হয়ে বললেন যে, ‘যখন ক্ষুধা লাগে তখন কেন খাবে না? সংকোচবোধ করছো?’। একথা শুনে আমি ভয়ে ভয়ে বসে পড়লাম এবং চুপিসারে খানা খেতে থাকলাম। চাচা আবু সাঈফ কিছুক্ষণ পর মুচকি হেসে বললেন যে, ‘ক্ষুধা লাগলে খাবার খাও, এ ধরনের সংকোচবোধ ভালো নয়!’

চাচা আবু সাঈফের আতিথেয়তা!

চাচা আবু সাঈফের মেহমানদারীর তুলনা হয় না। দস্তরখানে মেহমানের জন্য তার সাধ্যের মধ্যেকার সকল কিছুই সাজাতেন। লেখক কিছুদিন তার বাড়িতে মেহমান হিসেবে ছিলেন। তখন নাস্তা হিসেবে সকালে পরোটা, কোন তরকারী, ডিম, পনির, মুরব্বা, মধু এবং চা থাকতো। আর সকালের নাস্তা মোটামুটি সূর্য ওঠার আধঘণ্টা পরেই হয়ে যেত।

সকাল দশটার দিকে গ্রিন চা অথবা কফি আসতো। সাথে কোন শুকনো ফলজ খাবার বা নিমকি অবশ্যই থাকতো। আবার যোহরের নামাযের পূর্বেই দুপুরের খাবার - যা গ্রহণ করা আমার জন্য বেশ কষ্টকর ছিল। যোহরের নামাযের পরে আবার চা-য়ের ব্যবস্থা করা হতো।

পুনরায় আসরের নামাযের পরে চা এবং ফল জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পুনরাবৃত্তি ঘটতো (এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, পাকিস্তানে চা বলতে কোন পানি না মিশিয়েই দুধের

মধ্যে চা-য়ের পাতি দিয়ে পান করা বুঝায়)। মাগরিবের নামাযের পরে রাতের খাবার খাওয়া, আমার জন্য সকালের নাস্তা ও দুপুরের খাবারের চেয়ে অনেক বেশি কষ্টকর হতো। মেহমান যতদিন ইচ্ছা সেখানে কোন ধরা বাধা ছাড়াই মেহমানদারী পেয়ে পরিতৃপ্ত হতেন। এখানেই শেষ নয়, মেহমান এবং মুজাহিদ সাথীর কাপড় ধোয়া, কাপড় আয়রন করে দামী আতর লাগিয়ে রাখা আবু সাঈফ ভাইয়ের সব সময়ের আমল ছিলো।

বিপদ-আপদে সবর করা

চাচা আবু সাঈফ বিপদ-আপদে ধৈর্যশীল ছিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টিতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। একবার চাচা আবু সাঈফের এক না-বালেগ সন্তান নিজের ভুলের কারণে, হঠাৎ করে একটি গ্রেনেড ফেটে শহীদ হয়ে যায়। সন্তানের ক্ষেত্রে এহেন ভুলের কারণে তিনি আতংকিত হয়ে পড়েন। সাথে থাকা এক ব্যক্তি পরবর্তীতে জানান, চাচা আবু সাঈফ এটাকে ভুল জনিত হত্যা (قتل خطاء) বলে ভেবেছিলেন। সন্তানের এমন ভুলের কারণে সন্তানের পক্ষ থেকে কাফফারা হিসেবে একাধারে দুই মাস রোযা রাখেন। এভাবে রোযা রাখাটা চাচা আবু সাঈফের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। চাচা আবু সাঈফের সবরের ক্ষেত্রে কোন ধরনের কমতি ছিলো না। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার সন্তানসহ খান্দানের সকলকে স্বীয় রহমতের চাদরে আবৃত করে রাখুন। আল্লাহ্ পাক সমস্ত বিশ্বাসীদেরকে উক্ত দোয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আমিন।

তাকওয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত চাচা আবু সাঈফ!

আবু সাঈফ চাচার একজন জিম্মাদার বলেন যে, উস্তাদজী (রহ.) এর মাজমুয়াতে যে সাথীরা ছিলেন তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য চাচা আবু সাঈফকে জিম্মাদারি দেওয়া হয়। উক্ত জিম্মাদারি আদায় করতে গিয়ে তাকে প্রায়ই পেশওয়ারে যাতায়াত করতে হতো। অনেকবার এমন হয়েছে যে, চাচা আবু সাঈফ জিহাদের কাজের জন্য টাকা-পয়সা খরচ করেছেন, কিন্তু কোনো হিসেব নিকেশ রাখেন নি। কারণ, এসকল খরচ তিনি নিজের পকেট থেকেই করতেন।

একবার চাচা তার আহলিয়ার কিছু স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে একজন জিম্মাদারের নিকট এসে বললেন যে, "এগুলো বায়তুল মালে রেখে আমাকে কিছু নগদ অর্থ দেন, আমার নগদ টাকার খুবই প্রয়োজন। পরে যখন আমি উক্ত টাকা পরিশোধ করতে পারবো তখন এগুলো ফেরত নিয়ে যাবো"। সেই জিম্মাদার উস্তাদজী (রহ.) এর সাথে সে ব্যাপারে আলোচনা করলে উস্তাদজী অনুমতি দেন।

উক্ত জিম্মাদার ভাই প্রায় আশি হাজার রুপি এনে চাচার হাতে দেন। তখন চাচা তার কাছে থাকা অলঙ্কার জমা দিয়ে রুপিগুলোকে গুনতে লাগলেন। চাচা দশ হাজার রুপি আলাদা করে বাকি সত্তর হাজার রুপি জিম্মাদারের নিকট ফেরত দিয়ে বললেন যে, "এগুলো বায়তুল মালে জমা করে দাও"।

এ ঘটনা দেখে জিম্মাদার হয়রান হয়ে যান এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, "কেন এ টাকা বায়তুল মালে জমা রাখলেন"? উত্তরে চাচা বলতে লাগলেন যে, "আমার কাছে পয়সা থাকলে খরচ হয়ে যায়, কোনো হিসেব নিকেশ রাখতে পারি না। তাই এ পয়সাগুলো বায়তুল মালে নিয়ে নাও"।

সুবহানাল্লাহ্! এই হলো বায়তুল মাল সম্পর্কে এ সকল আল্লাহ্ ওয়ালাদের খোদা ভীতি বা তাকওয়া। তাঁদের আল্লাহ্ তা'য়ালাকে এমনভাবে ভয় করার কাহিনী শোনার এবং জানার পর আমাদের পূর্বসূরিদের কথা স্মরণ হয়ে যায়।

সব ধরণের খেদমতের জন্যই চাচা নিজেকে অগ্রগামী করে রাখতেন। বিশেষতঃ মুজাহিদীনদের জন্য মারকায এবং ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে খুবই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। কোনো কিছু নির্মাণের সময়েও তার বিনয়ের গুণটি পূর্ণমাত্রায় দেখা যেত। মুজাহিদীনদের জন্য মারকায ও ঘর নির্মাণের এ কাজে অনেকেই অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু টয়লেট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কাজ করাটা অনেকেই স্বভাবগত ভাবে অপছন্দ করে থাকেন। এ অপছন্দ অহংকার বসত নয়, বরং স্বভাবগত। তবে চাচা আবু সাঈফ টয়লেট সেট করা, নালা তৈরি করা, টয়লেটের গর্ত করা সহ সব কিছুতেই নিজেকে সবার আগে রাখতেন এবং অন্য কেউ এসব কাজ করতে গেলে তাকে করতে দিতেন না। আল্লাহ্ তার প্রতি প্রশস্ত রহমত বর্ষণ করুন।

বিনয় ও নম্রতা

চাচা আবু সাঈফের বিনয়ের দু'একটি ঘটনা বর্ণনা করেই মূল আলোচনায় ফিরে যাবো। চায়ের প্রতি চাচার খুবই আসক্তি ছিলো, এবং চায়ের মধ্যে অনেক চিনি খেতেন। একদিন মুসয়াব ভাই চাচার জন্য চা নিয়ে আসলেন, কিন্তু তাতে চিনির পরিমাণ ছিলো খুবই কম। আলাদা কোনো চিনির ব্যবস্থাও ছিলো না।

চাচা কোনোরূপ অভিযোগ ছাড়াই সম্পূর্ণ চা পান করে নেন। পরে যখন মুসয়াব ভাইয়ের মনে পড়লো যে, চাচার চায়ে চিনি কম হয়েছে তখন খুবই লজ্জিত হন এবং চাচার নিকট ওজর পেশ করেন। চাচা বললেন যে, এটা কোনো ব্যাপার না।

চাচা আবু সাঈফের চা পানের আরেকটি ঘটনা

চাচাকে একবার জনৈক ব্যক্তি চা খাওয়ান। চা-ওয়ালা সম্ভবত চিকন চিনি ব্যবহার করতেন এবং তার সামনে চিকন চিনির পাত্রের পরিবর্তে মোটা দানার লবণের পাত্র ছিলো। তাই চা-ওয়ালা চা-য়ে চিনির পরিবর্তে লবণ ঢেলে দেন, ফলে চা খুবই কড়া হয়ে যায়। তারপর চাচা আবু সাঈফকে উক্ত চা দিয়ে দেন। চাচা নিজের কাপে চা ঢেলে নেন। একটুও ভ্রু না কুচকিয়ে সম্পূর্ণ চা পান করেন। অথচ যারা লবণ চা পান করেন তারাও এমন

লবণাক্ত চা পান করতে পারেন না, কেননা এটাতো লবণে বিষ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ বাদে যখন চা-ওয়ালা নিজের জন্য চা ঢালেন এবং পান করা শুরু করেন, তখন প্রথম ঢোকেই বুঝতে পারেন কি কারণে এ পাত্রের চা বিষে পরিণত হয়েছে। সাথে সাথেই চাচার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু চাচা তাকে বুঝতেই দিলেন না যে, তার কোনো কষ্ট হয়েছে।

একদিন চাচা আবু সাঈফ নিজেই বলেছিলেন যে, একবার শায়খ আহসান আযিয চাচার কাছে একজন লোককে পাঠালেন। লোকটি চাচার নিকট জানতে চাইলেন – "আবু সাঈফ ভাই! আপনি কি এন্টি-এয়ারক্রাফট গান চালাতে পারেন?" চাচা আবু সাঈফ বললেন, "হ্যাঁ, চালাতে পারি।"

উক্ত লোকটি সন্দেহবশত চাচা চালাতে পারেন না বলে শায়খ আযিয সাহেবকে জানালেন। শায়খ আযিয সাহেব চিন্তা করলেন এবং নিজেই চাচাকে ডেকে পাঠান। এরপর চাচাকে এন্টি এয়ারক্রাফট গান চালাতে পারেন কি-না জানতে চাইলেন। চাচা বললেন যে, "হ্যাঁ, পারি"। শায়খ আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কবে, কোথায় চালিয়েছেন?"

চাচা উত্তরে বলেন - আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিপক্ষে একবার আমরা এক মোরচায় অবস্থান করছিলাম। সেখানে একটি এন্টি এয়ারক্রাফট গান সেট করা ছিলো। ঐ মোরচার নিকটেই একটি রুশ বোমারু হেলিকপ্টার এসে পড়লে এক মুজাহিদ সাথী গানটা দিয়ে হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে ফায়ার করতে শুরু করেন। তখন হেলিকপ্টার থেকে বোম্বিং করা শুরু হয় এবং বোমার আঘাতে ঐ সাথী শাহাদাত বরণ করেন। তারপর ঐ স্থানে আরেকজন সাথী যান এবং সেও শাহাদাত বরণ করেন"। চাচা বলেন যে, "এরপর ঐ দ্বিতীয় শহীদের জায়গায় আমি যাই এবং হেলিকপ্টারের দিকে ফায়ার করতে শুরু করি। ফলে শত্রুরা পালাতে বাধ্য হয়। এই হলো আমার এন্টি-এয়ারক্রাফট গান চালানোর অভিজ্ঞতা"। এ কথা শুনে শায়খ যারপরনাই আনন্দিত হন এবং তার মাজমুয়ার এন্টি-এয়ারক্রাফট গানের দেখাশুনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব চাচাকে অর্পণ করেন।

চাচা আবু সাঈফের শাহাদাত!

আমাদের চাচা আবু সাঈফ তার যৌবন, বার্ধক্যের সূচনা ও শেষ সবটুকুই জিহাদের ময়দানে উৎসর্গ করেছিলেন। একাজে দাড়ি এবং মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল। হাত ও মাথার উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। তাঁর মতো এমন বয়স্ক ব্যক্তিও ইমারতে ইসলামিয়ার সীমান্তে অবস্থানকালে আমেরিকার ড্রোন-মিসাইলের নিশানায় পরিণত হন এবং জীবনকে জীবনদাতার নিকট সোপর্দ করে দেন।

বৃদ্ধ চাচা আবু সাঈফ শাহাদাতের মালা গলায় পরে সজীব হয়ে উঠেন। তার নিকট শাহাদাতের চেয়ে কোনো জিনিস বড় ছিলো না। শেষমেশ এই শাহাদাতকেই তিনি আলিঙ্গন করে নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার ওয়ারিশ ও আওলাদদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন। চাচা আবু সাঈফ (রহ.) এর যাবতীয় ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা করে দেন। আমিন - ইয়া রাব্বাল আ'লামিন।

শানে রিসালাতের মাসয়ালা

গত মজলিসে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, উস্তাদজী (রহ.) শানে রিসালাতের জন্য বেহায়া ক্রুসেডার ডেনমার্কে আত্মঘাতী হামলা চালানোর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। একটা কথা বলা হয়নি, যা উস্তাদজী (রহ.) এর নির্ভরযোগ্য একজন ব্যক্তি বলেছেন।

উস্তাদজী (রহ.) যখন স্বীয় মাজমুয়ার ফিদায়ী সাথীদের থেকে দু'জন - 'শফিক ভাই' ও 'উসমান ভাইকে' পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানালেন, তখন উস্তাদজী (রহ.) এর নিকটতম এক সাথী তাদেরকে রেখে দেওয়ার কথা জানালেন। উস্তাদজীর সাথী বলেছিলেন, "এ দুজন খুবই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সাথী। তাদের দিয়ে অনেক বড় ধরনের কাজ আঞ্জাম দেওয়া যাবে। আরেকটি বিষয় হলো - এদের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাথীদের শাহাদাতের মাধ্যমে এদের নিচের (মামুর) সাথীদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। তাহলে এদেরকে কেন পাঠাচ্ছেন"?

উত্তরে উস্তাদজী (রহ.) বললেন, "শানে রিসালাতের মাসয়ালা এমন-ই যে, এর মধ্যে যত উত্তম সাথী পাঠানো যায় ততই ভালো"! এরপর ঐ দুই সাথীকেই পাঠিয়ে দিলেন। [বিস্তারিত আলোচনা ১০ম সংখ্যায় দ্রষ্টব্য]

শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহ.) এর শপথ!

আরো একটি কথা জানতে পারা যায় যে, উস্তাদজী (রহ.) দু'টি কারণে এ ফিদায়ী হামলায় জোরেশোরে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। একটি হলো: যা পূর্বের সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শানে রিসালাতের মহব্বত ও ভালোবাসা ছিলো অপরিসীম। আর দ্বিতীয়টি হলো: শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহ.) এর ঐ শপথ (فلتثكلن امهاتنا ان لم ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم) অর্থাৎ আমাদের মায়েরা আমাদের জন্য ক্রন্দন করুন; যদি না আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (প্রতিশোধ গ্রহণ করে) সাহায্য না করি। এভাবেই উস্তাদজী (রহ.) শানে রিসালাতের ভালোবাসার দাবীকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন এবং শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহ.)-এর কসম বা শপথকে পূর্ণ করেছেন।

কম্পিউটার সিকিউরিটি

আমার মুর্শিদ ক্বারি উসামা ইব্রাহীম গোরী (রহ.), উস্তাদজী (রহ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। এই সাক্ষাতের কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিলো: তারমধ্যে একটি হলো- কম্পিউটারের সিকিউরিটি বিষয়ক দাওরা করানো। উস্তাদজী (রহ.) এর সাথে এই দাওরার সাক্ষাৎ-ই ছিলো শেষ সাক্ষাত। লেখক ঐ দাওরাতে উস্তাদজী

(রহ.), তার নায়েব এবং ভাই দাউদ গোরী প্রমুখদের সাথে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন।

উস্তাদজী (রহ.) এর মাজমুয়ার মধ্যে আমার ঐ মুর্শিদ-ই সবার আগে কম্পিউটার সিকিউরিটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। মুর্শিদের একজন মালদ্বীপি প্রশিক্ষক ছিলো যাকে মুর্শিদ 'উস্তাদ আব্দুল কাদের' নামে স্মরণ করতেন। মুর্শিদ এ বিষয়টি প্রথম থেকেই শিখেন নি। তবে তিনি এটা অন্যদের তুলনায় ভালো বুঝতেন। এ ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবার কারণেই নিজের সমমানের সাথীদেরকে দাওরা করাতেন এবং যার ধারাবাহিকতা এখনো চালু রয়েছে। মুর্শিদ (রহ.) এর বড় একটি বৈশিষ্ট্য হলো - তিনি কোন কল্যাণকর বিষয় শিখতে চাইলে শুরুতেই তার উপর আমল করা শুরু করতেন। দ্বিতীয়ত: ঐ বিষয়টিকে সবার আগেই শিখে নিতেন এবং সে বিষয়ে সবাইকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করতেন। কম্পিউটার সিকিউরিটির শিখার ক্ষেত্রেও এমনটাই হয়েছে।

উস্তাদজী (রহ.) এর আদব!

মুর্শিদ যখনই আমাদের মারকাযে আসতেন তখনই আমাদেরকে বলতেন - দাওরা হবে। কিছুদিন পরে উস্তাদজী (রহ.) ও তার নায়েব আসলেন। উস্তাদজী (রহ.) বড় আদবের সাথে মুর্শিদ (রহ.) এর সাথে অবস্থান করেছিলেন। যদিও বয়স, মাকাম, মর্তবা এবং ইলমী যোগ্যতায় উস্তাদজী (রহ.) অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু এখানে মুর্শিদ (রহ.) উস্তাদের মতো আর উস্তাদজী (রহ.) কে ছাত্রের মতো আচরণ করতে দেখা যায়। উক্ত দাওরাতে উস্তাদজী (রহ.) কয়েকবার মুর্শিদ (রহ.) এর খাস বিষয় (কম্পিউটার সিকিউরিটি) সম্পর্কে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ চান। ভবিষ্যতে তার বাস্তবায়নের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন।

এ দাওরাটি প্রায় তিনদিন হয়েছিল। মুর্শিদ (রহ.) কম্পিউটার সিকিউরিটি এবং ইন্টারনেট সিকিউরিটির যত বিষয় শিখেছিলেন তার সবকিছু আমাদেরকে শিখান। এটাই আমাদের মাজমুয়াতে কম্পিউটার নিরাপত্তা বিষয়ের প্রথম দাওরা ছিল। আল্লাহর অশেষ ফজল ও করমে এখন এই দাওরা অন্যান্য মাজমুয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছে। পাকিস্তান ও বররে সগীরের দাওয়াতি, আলমী, গুপ্তচরবৃত্তি এবং আসকারী দলের মধ্যে এর বাস্তব আমল শুরু হয়েছে।

উক্ত দাওরা কেমন ছিলো, এখানে তার আলোচনা করা সম্ভব না। শুধু তার মধ্যেকার কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা জরুরী। এ দাওরাতে কম্পিউটারে রাখা ডাটা বা তথ্যকে ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা, পাঠানো (সেন্ড করা), বার্তাকে নিরাপত্তার সাথে হেফাজত করা এবং নিজের কর্মপদ্ধতি তৈরি করা বিষয়ে পড়া ও পড়ানো হয়েছিল। এ বিষয়ে শরিয়তের নির্দেশনা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল।

আমার যতটুকু মনে পরে এটাই ছিলো উস্তাদজী (রহ.) এর সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ। কম্পিউটার সিকিউরিটির ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ উস্তাদজী (রহ.) কে আমল করতে দেখিনি। কিন্তু কয়েক মাস পরে দ্বিতীয়বার দীর্ঘ সময় উস্তাদজী (রহ.) এর সাথে থাকার সৌভাগ্য লাভ করি। তখন এটা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম যে, উস্তাদজী (রহ.) কয়েক সপ্তাহ ব্যয় করে নিজের ডাটাগুলোকে কয়েক স্তরে সংরক্ষণ করেছেন। ইনশা আল্লাহ্ এ ব্যাপারে সুযোগ বুঝে বিস্তারিত বলবো।

মোটকথা এ কথাটি বোঝা খুবই জরুরী - যা আমাদের প্রিয় শায়খ কাসেম আর-রহিমী (আল্লাহ্ তাকে হেফাজত করুন) বলেন যে, 'আমাদের লড়াই তথ্যের লড়াই'। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জন্য জরুরী হল, তথ্যের লড়ায়ের ময়দানে স্বীয় তথ্য-উপাত্ত বা ডাটা সমূহকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরভাবে হেফাজত করা। আমাদের জন্য যতটুকু সম্ভব চাই তা ডেক্সটপ কম্পিউটার হোক বা ল্যাপটপ হোক, সেটাকে নিরাপত্তার সাথে ব্যবহার করা খুবই জরুরী।

লেখক একবার এক আলেমে দ্বীনের সাথে এ ব্যাপারে কথা বললে তিনি বলেন যে, জিহাদের প্রস্তুতির জন্য যে আদেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে যা –

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿60﴾

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।

(সূরা আনফাল-৬০)

উক্ত আয়াতে কারীমা থেকে বোঝা যায়, এর মধ্যে কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা অর্জনও অন্তর্ভুক্ত। এ কথা ঠিক যে, এ দক্ষতা সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যে এর ব্যবহার করে তার জন্য দক্ষতা অর্জন করা জরুরী। পূর্বের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় - যেখানেই এ দক্ষতা অর্জনের গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তা এইজন্য যেন ঐ রাস্তা দিয়ে শত্রু আমাদের পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম না হয়। তা না-হলে মুজাহিদীনের এ রাজপথে চলা কঠিন হয়ে পড়বে। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা।

উস্তাদজী (রহ.) এর আলোচনার মজলিশ এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক কথা বলা এবং সঠিক পথের পথিক বানিয়ে দিন। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং আমীরদের অনুগত ও অনুসারী হওয়ার তাওফিক দান করুন।

আমিন- ইয়া রব্বাল আলামিন।

অনুবাদ: আখতারুজ্জামান

প্রথম পর্ব সমাপ্ত।

[চলবে- ইনশা আল্লাহ্]

প্রথমআলো-ডেইলি স্টার আপনাকে শেখাবে ক্ষমতাসীন আর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে দেখতে। বিবিসি, সিএনএন, ভয়েস অফ অ্যামেরিকা আপনাকে শেখাবে পশ্চিমা কাফিরদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে বিচার করতে। আর আমরা আপনাকে জানাব আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট আর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান। তাই আমাদের সাথেই থাকুন, ইসলামের দৃষ্টিতে বাস্তবতাকে দেখতে নিয়মিত ভিজিট করুন।

https://dawahilallah.com/
https://alfirdaws.org/
http://gazwah.net/

